মন-প্রকৌশল
স্বপ্ন অনুপ্রেরণা
আর জীবন গড়ার ফরমুলা
রাগিব হাসান

আদর্শ
প্রকাশক মামুন অর রশিদ
১৭৬ ফকিরাপুল ঢাকা ১০০০
০১৭১২২৯১৬৪৪ ০১১৯১২৩২৭৭৪ ০১৭৯৩২৯৬২০২
email info@adarshabd.com
Website www.adarshabd.com

মন-প্রকৌশল : স্বপ্ন অনুপ্রেরণা আর জীবনগড়ার ফরমুলা
২য় সংস্করণ ফাল্গুন ১৪২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
১ম সংস্করণ ২য় মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
১ম প্রকাশ মাঘ ১৪২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রচ্ছদ মানবেন্দ্র গোলদার
ব্যবস্থাপনা খাইরুল ইসলাম আদর্শ সার্ভিস
মুদ্রণ শিহাব উদ্দিন কর্তৃক আদর্শ প্রিন্টিংস বাংলাদেশে মুদ্রিত ও বাঁধাইকৃত
অনলাইন পরিবেশক www.rokomari.com/adarsha

মূল্য ২২০ টাকা

Mon-Prokoushal: Shwapna Anuprerona Ar Jibon Gorar Formula
by Ragib Hasan
Published in February 2016 by Adarsha
176 Fakirerpool Motijheel Dhaka 1000

Price Tk. 220:: US$ 20

ISBN 978-984-8875-87-2

মুখবন্ধ

রাগিব হাসান আমাকে একটা পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছে। আমাকে অনুরোধ করেছে বইটা নিয়ে কিছু লিখে দিতে। লিখতে গিয়ে আমার মনে হলো : আমি কি বইটি নিয়ে লিখব, নাকি রাগিব হাসানকে নিয়ে লিখব? মনে হয় প্রথমে রাগিব হাসানকে নিয়েই একটু লিখি।

আমাদের দেশে লেখাপড়া নিয়ে অনেক সমস্যা সবাই বছরের শুরুতে বই পেয়ে যায়, কিন্তু বইগুলো খুব ভালো না; আরও অনেক ভালো হতে পারত। কিন্তু যারা চোখে দেখতে পায় না তাদের জন্য কিছুই নেই, তারা কোনো বই পায় না। তারা তো আর সাধারণ বই পড়তে পারে না, তাদের দরকার ব্রেইলে ছাপানো বই। সেই বইগুলো তাদের হাতে দেয়ার জন্য অনেকে ব্যক্তিগত বা আলাদাভাবে চেষ্টা করেও সুবিধে করতে পারে না। কারণ বোর্ডের বইগুলোর কোনো ইলেকট্রনিক কপি নেই। ব্যাপারটা রাগিব হাসানের চোখে পড়ল এবং সে আর দশজনের মতো ব্যাপারটা নিয়ে হা-হুতাশ না করে সরাসরি কাজে লেগে গেল। সারা পৃথিবীর সব উৎসাহী বাঙালি তরুণদের দিয়ে বইগুলো নতুন করে টাইপ করানো শুরু করল এবং দেখতে দেখতে বইগুলোর ইলেকট্রনিক কপি তৈরি হয়ে গেল, অডিও কপি তৈরি হতে লাগল, ব্রেইল বই বের হতে লাগল। কী চমৎকার একটা ব্যাপার। এই জন্যে আমি আমার দেশের তরুণদের এত পছন্দ করি। তারা ধানাইপানাই হা-হুতাশ অজুহাত অভিযোগ না করে কাজ শুরু করে দেয়।

রাগিব হাসানের আরও অনেক কাজ আছে, সেগুলো নিয়ে কিছু না বলে এবার এই বইটা নিয়ে কথা বলি। আমি আমার জীবনে দেখেছি একজন মানুষকে দিয়ে সত্যিকারের কোনো কাজ করিয়ে নিতে হলে তাকে কিন্তু টাকাপয়সা বা সম্মানী দিতে হয় না। তাকে উৎসাহ দিতে হয় (এই জন্যে যখন কোনো বড় কাজ করতে হয় আমি ভলান্টিয়াররে খুঁজি)। কিন্তু উৎসাহ দেয়ার জন্যে মানুষটাকে খুঁজে পেতে হয়। যার সাথে আমার দেখাই হয়নি, তাকে আমি উৎসাহ দেব কেমন করে? তখন দরকার রাগিব হাসানের 'মন প্রকৌশল' ধরনের বই। পৃথিবীর সব দেশেই

এ ধরনের বই আছে, আমাদের দেশে সেভাবে আমার চোখে পড়েনি। এর অভাব খানিকটা দূর হলো।

বইটা পড়ে একধরনের অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। মন প্রকৌশল শব্দটা কটমটে মনে হতে পারে, কিন্তু বইটা মোটেই কটমটে নয়। খুব গুছিয়ে লেখা হয়েছে। স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে, নিজেকে বদলে দেয়ার কথা বলা হয়েছে, ঘুরে দাঁড়ানো মানুষদের কথা বলা হয়েছে। অসংখ্য উদাহরণ দেয়া হয়েছে, অসংখ্য গল্প বলা হয়েছে। আমি নিজে এই বয়সে অনেকগুলো গল্প বা ঘটনার কথা পড়ে নিজের ভেতর একধরনের উত্তেজনা অনুভব করছি, সাহস পেয়েছি। কাজেই ধরে নিচ্ছি অন্যেরাও পাবে।

বইটির নামে যেহেতু প্রকৌশল বা ইঞ্জিনিয়ারিং শব্দটা আছে, তাই রাগিব হাসান সত্যিকারভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং করার জন্যে ছোট ছোট ধাপ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে। আমাদের তরুণদের কিছু বাঁধাধরা সমস্যা আছে, সেই সমস্যাগুলোর কথা বলা আছে। হতাশ হয়ে যাওয়া সেই তরুণদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এই বইটা পড়ে এক ধরনের শক্তি পাবে, এক ধরনের সাহস পাবে, নিজের ভেতর অনুপ্রেরণা খুঁজে পাবে।

রাগিব হাসানের সাথে আমি শুধু একটা কথা যোগ করে দিই এই বইয়ের গল্পগুলো, যার উদাহরণগুলো হচ্ছে বড় বড় মানুষের উদাহরণ, বিখ্যাত মানুষের গল্প, পৃথিবীর সবাই কিন্তু বড় নয়, সবাই বিখ্যাত নয়, তাদেরও অনেক গল্প আছে; যে গল্পগুলো মিডিয়াতে আসেনি, পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়নি। সেই গল্পগুলোর কথা জানলে আমরা নিশ্চয়ই আরও হতবাক হয়ে যেতাম।

মুহাম্মদ জাফর ইকবাল
২২ জানুয়ারি ২০১৫

ভূমিকা

আশা। দুই অক্ষরের ছোট্ট একটা শব্দ। অথচ প্রচণ্ড ক্ষমতাধর এই শব্দটা।

স্বপ্ন। আমাদের মনের গহিনে থাকা চিন্তা, ভবিষ্যতের কথা, অব্যক্ত বাসনার চিত্রময় প্রকাশ।

অনুপ্রেরণা। মন জাগানোর, আলো দেখার অনুভূতি, ভাবনা।

এই আশা, স্বপ্ন আর অনুপ্রেরণা আছে বলেই আমরা মানুষ, আমরা নই রোবট।

জীবন সব সময় সরলরেখায় চলে না, সেই জীবনের পথ চলায় কখনো কখনো দেয়ালে ঠেকে যায় পিঠ। আলোর বদলে চোখে ভাসে কেবলই আঁধার। এই বইটা তাদের জন্য, যাদের জীবন থেকে আশার আলো হারিয়ে গেছে, হতাশা আর দুঃখ স্থান করে নিয়েছে মনে।

আমাদের সবচেয়ে কাছের, সবচেয়ে আপন জিনিস হলো আমাদের মন। সেই মন যদি হয় বিক্ষিপ্ত, কিছুতেই মনকে ভালো করতে না পারেন, তবে মনটাকে সারিয়ে নিন। মন প্রকৌশল হলো সেটাই বেয়াড়া মনকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আনার, স্বপ্ন দেখার অভ্যাস গড়ে তোলার, অনুপ্রেরণা পাবার কলা-কৌশল।

বাংলা ভাষায় অনুপ্রেরণামূলক বইয়ের বড়ই অভাব। প্রিয় জিনিসটি না পেয়ে, স্বপ্নের পেশা কিংবা পড়ার বিষয় না পেয়ে জীবন থেকে আশা, স্বপ্ন চলে গেছে বহু মানুষের। এই বইটা তাঁদের জন্যেই লেখা। জীবনের দুঃসময়ে অল্প একটু কথা, অল্প একটু স্বপ্ন দেখাতে পারলেই কারও কারও জীবন যেতে পারে পাল্টে। এক বছর ধরে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে এই স্বপ্ন দেখার কথাগুলো বলে অনেক মানুষের সাড়া পেয়েছি, স্বপ্ন দেখতে চাওয়া স্বপ্নবাজদের সংখ্যা দুনিয়াতে কম নয়।

এই বইটা আলাদিনের চেরাগ নয়। সবার জীবনের সব সমস্যা রাতারাতি দূর করে দেয়ার মতো জাদুরকাঠি আমার হাতে নেই। কিন্তু এই বইয়ে যা আছে তা হলো— ছোট্ট কিছু পরামর্শ, পথ দেখার নির্দেশনা। মন প্রকৌশলের এই কাজগুলো করলে, এই লেখাগুলো পড়লে হয়তোবা কেউ না কেউ পাবেন চলার পথের দিশা, দেখতে পাবেন স্বপ্ন আর সেই স্বপ্ন ও অনুপ্রেরণায় গড়ে নিতে পারবেন জীবনকে।

স্বপ্ন দেখার, অনুপ্রেরণায় জীবনকে পাল্টে দেয়ার সময়টা এক্ষুনি। কাল বা পরশু নয়। তাই শুরু করে দিন।

শুরু হোক আপনার এগিয়ে যাওয়া, সব বাধা, সব বিঘ্নকে জয় করে, সামনের দিকে, স্বপ্নের দিকে।

শুভ্র, সুন্দর, আনন্দময় স্বপ্নের জীবনের দিকে।

সূচি

স্বপ্ন ও আমরা

স্বপ্ন।

ছোট্ট একটা শব্দ।

অথচ এই শব্দটাই পাল্টে দিতে পারে আমাদের জীবনকে।

প্রতিকূলতাকে জয় করতে, নিজের জীবনের মোড় ঘোরাতে হলে আপনাকে দেখতে হবে স্বপ্ন। এই স্বপ্নটা ঘুমের মাঝে দেখা স্বপ্ন না, এটা হল জেগে জেগে দেখা ভবিষ্যত জীবনের স্বপ্ন।

স্বপ্ন দেখতে পারাটা মানুষের মানবিকতার একটা বড় অংশ, হয়তোবা সবচেয়ে বড়। রোবট, কম্পিউটার এদের সাথে আমাদের বড় পার্থক্য এটাই। কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়ে প্রায় ১৮ বছর কাটানোর পরে এটা বিশ্বাস করি, অল্প কয়েক বছর পরেই কম্পিউটার বুদ্ধিমত্তায় মানুষকে ছাড়িয়ে যাবে, টুরিং টেস্টে পাস করবে সহজেই। কিন্তু তার পরেও আমরা মানুষেরা হয়ে থাকবো অনন্য।

আমরা হয়তোবা বিদ্যুৎগতিতে কাজ না করতে পারি, কিন্তু ...

আমরা যে স্বপ্ন দেখতে পারি, অসাধারণ অসম্ভব সব স্বপ্ন···

আর এজন্যই আমরা মানুষ, আমরা ভীষণ প্রতিকূলতার মাঝেও জীবনকে পাল্টে দিতে পারি। আপনিও পারবেন। সারা বিশ্বে বহু মানুষ তা পেরেছে ইতিহাস জুড়ে। জীবনের নানা সমস্যা, নানা জটিলতায় পিছিয়ে গিয়ে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েও তারা পেরেছে, আর তা পেরেছে, কারণ এই সফল মানুষেরা স্বপ্ন দেখতে পেরেছে।

আপনিও পারবেন।

কারণ আপনি একজন মানুষ। স্বপ্ন দেখার ক্ষমতাটা নিয়েই আপনি জন্মেছেন। জীবনের মোড় ঘোরাতে হলে কেবল দরকার আপনার মনের এই ক্ষমতাটা জাগিয়ে তোলা, বেয়াড়া মনটাকে প্রকৌশলবিদ্যার কায়দা লাগিয়ে নিয়ে আসা সঠিক পথে। হতাশা আর মন খারাপ করে দেয়া সব

চিন্তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে অবশ্যই পারবেন আপনি, এই কথাটা সবার শুরুতে আপনাকে জপ করতে হবে বার বার।

শুরুটা তাহলে হয়ে যাক?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলুন তো,

আমি একজন স্বপ্ন দেখা মানুষ।

আমি আমার জীবনকে পাল্টে দিবো।

আমার মনের মাঝে এই শক্তি অবশ্যই আছে।

জগতের কোন শক্তি নেই, যা পারে আমার স্বপ্নকে ঠেকাতে।

আমার স্বপ্ন সত্যি হবেই।

এ আমার বিশ্বাস।

স্বপ্ন বনাম বাস্তবতা

বাংলাদেশে স্কুল, কলেজ, আর বিশ্ববিদ্যালয়— তিন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই গিয়েছি। কিন্তু কাকতালীয় ব্যাপার হল, সবখানেই তরুণ শিক্ষার্থীরা একটা প্রশ্ন করেছে। তিনজন তিন পর্যায়ের শিক্ষার্থীর কাছ থেকে একই প্রশ্ন পেয়ে চমকে গেলেও পরে বুঝলাম, এটা এখনকার শিক্ষার্থীদের একটা বড় প্রশ্ন, জবাব খুঁজতে তাই সবাই খুব আগ্রহী।

প্রশ্নটা হল—

"আমাদের অনেকের অনেক কিছু করার বা ক্যারিয়ার/ পড়াশোনার স্বপ্ন থাকে, "প্যাশন" থাকে নানা বিষয়ে, কিন্তু পরিবার থেকে চাপ দেয়ায় বা অন্য নানা কারণে সেটা করতে পারি না, পড়তে পারি না। তাহলে কী করে আমাদের স্বপ্নের কথা আমরা ভাববো, স্বপ্নের দিকে যাবো"?

প্রশ্নটার অনেক দিক আছে। শিক্ষার্থীরা যেমন নানা ব্যাপারে আগ্রহী, বাবা মায়েরাও তাদের সন্তানদের নানা বিষয়ে পড়াতে আগ্রহী। দুইটাই হতে পারে জেনে বুঝে, কিংবা হুজুগে পড়ে।

আগে একটা গল্প বলে নেই— এক'শ বছর আগে বিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল প্রাইজগুলোর অধিকাংশ পেয়েছিলেন জার্মান পদার্থবিদেরা। অনেক বাঘা বাঘা জার্মান পদার্থবিজ্ঞানীর জীবনী পড়তে গিয়ে মজার একটা জিনিস খেয়াল করলাম— তাঁরা আন্ডারগ্রাজুয়েটে পড়েছিলেন কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং! ঘটনা কী? আসল ঘটনা হল জার্মানিতে সেই সময়ে ছিল কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্বর্ণযুগ,

তাই বাবা মায়েরা জোর করে পড়িয়েছিলেন সেই বিষয়ে। পরে কিন্তু এরা নিজের পছন্দের বিষয়ে গিয়ে অসাধারণ সব কাজ করে গেছেন।

হুজুগে পড়ে কাজ করাটা দীর্ঘমেয়াদে অনুচিত। হুজুগটা শিক্ষার্থী কিংবা বাবা মা— দুই তরফ থেকেই হতে পারে। প্রথমেই তাই যেটা বলেছি আমার এই প্রশ্নকারী শিক্ষার্থীদের, বাবা মায়ের কথাটা আগে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন, তাঁরা সব সময়েই সন্তানের ভালোর জন্য এবং নিজেদের প্রজ্ঞা দিয়েই চিন্তা করছেন দীর্ঘমেয়াদে। কাজেই তাঁদের পরামর্শ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালোর জন্যেই।

তবে, এর পরেও যদি মনে হয়, আপনার যে পছন্দের বিষয়, সেটা আসলেই অনেক অসাধারণ হবে আপনার ক্যারিয়ারের জন্য, তাহলে একটা কাগজ নিয়ে লিখে ফেলুন কেন, সেটা। মানে কেন আপনার ক্যারিয়ার চয়েসটা উত্তম, সেটার পক্ষে যুক্তি তৈরি করে সেটা বোঝান বাবা মা কে, পরিবারের সবাইকে।"

আর তার পরেও যদি পছন্দের বিষয় বা ক্যারিয়ারে শুরুতেই যেতে না পারেন, নানা কারণে, তাহলেও কিন্তু মন খারাপ করে হুতুম প্যাঁচা হয়ে থাকার নাই দরকার। বরং খেয়াল রাখবেন, ডিগ্রি পেতে হয় চাকরির জন্য, কিন্তু নিজের উদ্যোগে পছন্দের কাজ করার জন্য কোন ডিগ্রি লাগে না। স্টিভ জবস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েননি, মার্ক জাকারবার্গ বা বিল গেইটসও পড়া শেষ করেননি। যে বিষয়েই পড়ে থাকেন না কেন, পছন্দের বিষয়ে কাজ করতে, নিজে নিজে শিখে নিতে নাই কোন বাঁধা।"

'পারবে না' এই কথাটা যে বলে, তাকে 'গদাম' বলে নিজের চেষ্টায় যান এগিয়ে, স্বপ্নের দিকে...

সফল ব্যর্থতা

সাফল্যকে নিয়ে আমরা মাতামাতি করি সব সময়, কিন্তু আমাদের ব্যর্থতাগুলো কি একেবারেই অর্থহীন? নাহ, ব্যর্থতার গুরুত্ব আসলে অনেকটা আমাদের সাফল্যেরই কাছাকাছিই, এবং অনেক সময়েই বেশি।

আবিষ্কারক হিসাবে টমাস আলভা এডিসন হাজার হাজার যন্ত্র বানিয়েছেন। বৈদ্যুতিক বাতির কার্যকর সংস্করণ বানাবার জন্য তিনি প্রায় ১০০০ বার চেষ্টা করে তবেই সফল হয়েছিলেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হল, এই অসংখ্য ব্যর্থতা নিয়ে, রীতিমত আকাশ থেকে পড়ে এডিসন বললেন, "কই, আমি তো ব্যর্থ হইনি। বরং ইলেকট্রিক বাল্ব কিভাবে বানানো যাবে না, তার ৯৯৯টি কায়দা হাতেনাতে দেখিয়েছি!"

সর্বকালের সেরা বাস্কেটবল তারকা মাইকেল জর্ডানেরও এরকম একটা কথা পড়লাম। তিনি বলেছেন, "আমি জীবনে ৯০০০ এর বেশি শট মিস করেছি। ৩০০ এর বেশি ম্যাচ হেরেছি। অন্তত ২৬ বার আমার কারণেই আমার দল হেরেছে, কিন্তু এই অসংখ্য হারার মধ্য দিয়ে আমি শিখেছি সফল হতে।"

কাজেই ব্যর্থতার গুরুত্ব অনেক অনেক বেশি। কখনো কখনো সফল হবার চাইতেও বেশি। কারণ ব্যর্থতা আমাদের শেখায় কী করে সফল হতে হয়, কিভাবে পেতে হয় জয়।

ব্যর্থতাকে হতাশার কারণ হিসাবে দেখাটা একেবারেই ভুল। প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন? তো কী হয়েছে? এডিসন, মাইকেল জর্ডান এরা যদি প্রথম চেষ্টাতে কখনো কিছু করতে না পারেন, রবার্ট ব্রুস যদি ৬ বার যুদ্ধে হারার পরেও হতোদ্যম না হয়ে ৭ম বারে জয়ের দেখা পান, তবে আপনিও পাবেন। আর ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাটা ঝুলিতে নিয়ে আপনি যখন এক সময়ে সাফল্যের দেখা পাবেন, তখন সে সাফল্যের মতো মধুর আর কি কিছু হবে?

ব্যর্থ হতে শিখুন, ব্যর্থতা হতে শিক্ষা নিন, আর ব্যর্থতাকে বরণ করে নিন জীবনের অনিবার্যতা হিসাবে।

ভয়

শুরু করি ২০১৪ এর বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিলের সেমিফাইনাল নিয়েই। নাহ, কতো গোল খেয়েছে তার হিসাব করার জন্য না, বরং খেলার সেই অদ্ভুত ৬ মিনিট নিয়ে বলব, যখন মাত্র এই অল্প সময়েই ৪টা গোল খেয়েছিল ৫ বারের চ্যাম্পিয়নেরা।

পর পর দুইটা গোল খাবার পরেই দেখবেন, ব্রাজিলের খেলোয়াড়েরা হয়ে আছে আড়ষ্ট। তাদের চোখের সামনেই হালি খানেক গোল দিয়ে দিল জার্মানেরা, চেয়ে চেয়ে খালি দেখল তারা।

এই যে আড়ষ্টতা, তার পিছনের সবচেয়ে বড় কারণটা মোটেও নয় অদক্ষতা, বরং কারণটা হল– ভয়।

হেরে যাবার ভয়, সব হারাবার ভয়।

ব্রাজিলের কথা থাক, আপনার নিজের কথাই ভাবুন। তার আগে লেস ব্রাউনের একটা উক্তি পড়ে নিন:

"Too many of us are not living our dreams because we are living our fears"

আপনার স্বপ্ন থেকে দূরে আছেন কেন? ভয়? পারবেন না, সেই ভয়? লোকে হাসবে, সেই ভয়? বকা খাবেন, সেটার ভয়?

স্বপ্নকে দিবাস্বপ্ন হিসাবে না রেখে পরিণত যদি করতে চান বাস্তব, তাহলে এই ভয়কে করতে হবে জয়। কেন ভয় পাবেন? সবার আগে একবার ঠাণ্ডা মাথায় নিজেকে প্রশ্ন করুন। জীবন একটাই, আর খুব অল্প সময়ের। ভয় পেয়ে পেয়ে যদি সে জীবনটা পার করে দেন, এক সময়ে পস্তাবেন অবশ্যই।

দার্শনিক প্লেটোর আরেকটা কথা–

"We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light".

জীবনের আলোর দিশা খুঁজে পেতে হলে তাই ভয়কে এড়িয়ে চলুন। ভয়ের কিচ্ছু নাই।

কিভাবে?

জপ করুন, ছোট্ট একটা মন্ত্র!

YOLO– You Only Live Once।

সহজ বাংলায়, কী আছে জীবনে। ডরাইলেই ডর...

জীবন হোক ভয়মুক্ত, স্বপ্ন হোক আলোকিত...

মেধা

ছেলেটা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিল। একবার না, চার চার বার! শ খানেক বছর আগে জিপিএ সিস্টেম ছিল না। পাশ ফেলের ব্যাপার ছিল। আর এই চার বারই ছেলেটা ১ সাবজেক্ট বাদে সব বিষয়েই ফেল করল।

তাকে কী বলা যায়? গাধা? রামগাধা? গবেট?

কিন্তু, ছেলেটা ১ বিষয়ে তো ঠিকই পাস করেছে প্রতিবারেই।

৩ ঘণ্টার পরীক্ষাটা প্রতিবারেই ৩০ মিনিটে শেষ করে এসেছে। খটোমটো সেই বিষয়ে বাকি অধিকাংশ ছাত্রই ফেল করে বসে, কিন্তু এই ছেলেটা? প্রতিবারেই ১০০ তে ১০০ পেয়েছে।

এবার তাকে কী বলবেন?

বিষয়টা কী ছিল?

বিষয়টা ছিল– গণিত।

আর অন্য সব বিষয়ে ফেল করা, কিন্তু গণিতে ১০০তে ১০০ পাওয়া ছেলেটার নাম?

শ্রীনিবাস রামানুজান।

গত কয়েকশ বছরের সেরা গণিতজ্ঞদের তালিকায় প্রথম ১০ জনের মধ্যেই অসাধারণ প্রতিভাধর রামানুজান আছেন, যাঁকে কেউ অংক করা শেখায়নি। বরং নিজে নিজে নিউজপ্রিন্টের ছেড়া কাগজে অংক করতে করতে অনেক কিছু বের করেছিলেন, আবার করেছিলেন সংখ্যাতত্ত্বের অভিনব সব আবিষ্কার। খুব অল্প বয়সে মারা যাবার সময়ে যেসব নোটবই ভর্তি গণিতের আঁকিবুঁকি রেখে গেছিলেন, এখনো ১০০ বছর পরেও সেগুলো থেকে বেরুচ্ছে গণিতের নতুন নতুন সব জিনিস।

কিন্তু এই প্রতিভাধর রামানুজান ফেলটু ছাত্র ছিলেন।

তা জেনে আপনার কী লাভ?

লাভটা এটাই, পরীক্ষায় ফল খারাপ হলেই গবেট হয় না, ফেল্টু হয় না, 'খারাপ' ছাত্র হয় না, সেটা বোঝা।

শতাব্দীর সহস্রাব্দীর সেরা প্রতিভা রামানুজান যদি পছন্দের বিষয় বাদে অন্য সব বিষয়ে ফেল করেন, তাহলে সেটা থেকে কী বোঝা যায়?

বোঝা যায় এটাই, প্রত্যেকের পছন্দের বিষয় আছে। ক্যারিয়ার, জীবন, সবকিছুর ক্ষেত্রেই পছন্দের বিষয়ে কাজ করার দরকার আছে।

মিঃ বিন খ্যাত রোয়ান এটকিনসনকে চেনেন তো? তিনি কিন্তু অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করা একজন ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে জীবন কাটালে হয়তো মামুলি একজন হয়েই থাকতেন, কিন্তু তাঁর পছন্দ, প্যাশন যেখানে, সেই কৌতুকাভিনয়েই তিনি জয় করেছেন সবার মন।

তো? আয়নায় দেখুন নিজেকে, এক্ষুনি।

আপনার পছন্দ কোনখানে? ফালতু মরীচিকার পিছনে সময় দিয়ে লাভটা কী? রামানুজনকে মেরে ধরে ইন্টারমিডিয়েট পাস করিয়ে ফেলা হয়তো এক সময় যেতো। সেটা করে কেরানীর চাকরিতে কাটাতে পারতেন সারাজীবন। অথবা ইঞ্জিনিয়ার বিন সাহেব। কিন্তু সেটা না করে পছন্দের, হৃদয়ের কাছের বিষয়ের দিকে গেছেন বলেই জীবনটা তাঁদের হয়েছে অসাধারণ।

আর দেরি কেন? এখনি চিন্তা করুন, আপনার পছন্দ কোনখানে? মন যেখানে, হৃদয় যেখানে, আত্মাও সেখানে, এমন বিষয়ে আপনার সাফল্য ঠেকাবে কে? কেউ না!

তাই পছন্দের কাজটা খুঁজে নিন স্টিভ জবসের মতোই, আর এগিয়ে যান সাফল্যের পানে।

সাফল্য

আমার এক বন্ধু একবার বলেছিল, সে নিজেকে সফল মনে করে, কারণ সে খুব অভিজাত জায়গায় থাকে, বাড়ি কিনেছে বিশাল, এবং নামী এক কোম্পানিতে কাজ করে উঁচু পদে।

প্রয়াত গায়ক শেখ ইশতিয়াকের সেই গানটা মনে আছে?

"ভাগ্যের ডাক্তার ভাগ্যটা দেখে বলে ভাগ্য তোমার অতি চমৎকার,

সুন্দরী বৌ হবে, ঘরেতে সুখ রবে, করবে অনেক কিছু আবিষ্কার"

আগামী প্রজন্মের অনেকের মনেই প্রশ্ন– সাফল্য কাকে বলে, আর সফল হতে হবে কী করে।

সাফল্যের সংজ্ঞাটা কী? আমার এই বন্ধুটির মতো সংখ্যা, সম্পদ, এবং আভিজাত্য?

হ্যাঁ, এবং, না– দুইটাই।

সাফল্যের সবচেয়ে বড় দিক হল সাফল্য জিনিসটা পুরাপুরি আপেক্ষিক। প্রমাণ করে দেই। ধরা যাক অংক পরীক্ষা হচ্ছে। সেখানে ১০০তে ৮০ পেয়েছে যে, সে কি সফল?

হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে।

৮৫ নম্বরের জবাব দিয়ে এসে ভয়ে ছিল যে, তার কাছে ৮০ কেন, ৭৫ পাওয়াটাও বিরাট সাফল্য। আবার যে অতি পড়ুয়া ছাত্রটি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর চাইতে এগিয়ে থাকতে চায়, সে ৯৯ পেলেও নিজেকে অসফল বলবে, যদি তার প্রতিদ্বন্দ্বীটি পায় ১০০। (বাস্তবে এমন লোক বেশ দেখেছি, আধা নম্বরের জন্যেও নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে করে, সে আরেক গল্প!)।

সাফল্যের সংজ্ঞাটা তাই হল নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়া, এবং আরো দূরে প্রসারিত নতুন স্বপ্ন শুরু করতে পারা। এবং পৌনঃপুনিকতায় সেই সাফল্যকে আরো আদিগন্ত করা বিস্তৃত।

আপনি যা করতে পেরেছেন, তাতে কি আপনি খুশি? তাহলেই আপনার হিসাবে আপনি সফল। you only live once ... অন্যের সাফল্যের পাল্লায় নিজেকে মাপতে গিয়ে নিরানন্দ হতাশায় ভোগার মানে কি আছে কিছু?

তাই আমার সেই বন্ধুটি ঢাকা থেকে সিলিকন ভ্যালিতে গিয়ে দামী গাড়িটা চালিয়ে যেটুকু সফল বলে দাবি করে, তার সাথে তিল তিল করে টাকা জমিয়ে নিজের রিকশার মালিক হওয়া একজন শ্রমজীবী মানুষের সাফল্যের পার্থক্যটা আদৌ খুব একটা বেশি না। দুজনেই সফল, স্বপ্নকে যদি তারা আনতে পারে হাতের মুঠোয়।

তবে একাকী সাফল্যের দাবি যে করে, সে দুনিয়ার বৃহত্তর অঙ্গনে সফল নয়। কারণ আফ্রিকার সেই প্রবাদটার মতোই সবাইকে নিয়ে বহুদূরে যে যেতে পারে, নিজের সাফল্যকে বিলাতে পারে চারিদিকে সবার মাঝে, করতে পারে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত... সেই আসল সফল মানুষ।

সাফল্যকে তাই আপেক্ষিকতায় দেখুন। নিজে কীসে সফল হবেন, তা বলতে পারবে কেবল একজনেই।

সেটা আপনি নিজেই।

নিজের সাফল্যের মাপকাঠিটা নিজেই বানিয়ে নিন। অন্যের চোখে সফল না, নিজের চোখে কখন কিভাবে সফল হবেন, তাই ভেবে নিন। এটা ভাবতে পারলেই সাফল্যের অর্ধেকটা ধরা দিবে আপনার কাছে। সহজেই।

আত্মবিশ্বাস

ফার্স্ট বনাম লাস্ট, বিজয়ী বনাম পরাজিত, সফল বনাম ব্যর্থ।
এদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়?

সবাই কিন্তু মানুষ। সেঞ্চুরি হাঁকানো ব্যাটসম্যানও মানুষ, আর তার সমান ক্ষমতা নিয়ে শূন্য রানে ডাক পিটানো খেলোয়াড়ও মানুষ।

তাহকে একজন সফল, আরেকজন ব্যর্থ কেন?

কারণটা খুব সহজ। তার আগে অনেক পুরানো একটা কথা শোনা যাক।

"বিজয়ীরা আগে জিতে, তার পরে যুদ্ধে নামে, আর পরাজিতরা? তারা তো যুদ্ধে যাবার আগেই হেরে বসে আছে"।

আড়াই হাজার বছর আগে চীনা দার্শনিক সান ৎসু এই কথাটা বলেছিলেন সফল আর ব্যর্থদের পার্থক্য নিয়ে, কিন্তু কী অসাধারণ ভাবে আজকেও এই কথাটা খুব সত্যি।

আপনি কি খেলার মাঠে নামার আগেই হেরে গেছেন?

পরীক্ষা দেয়ার আগেই ফেল করে বসে আছেন?

যদি থাকেন, তাহলে সেটা পাল্টাতে পারে কে?

ভাগ্য? নাহ...

মেধা? দক্ষতা? ক্ষমতা? ধরা যাক সেটাও আপনার আছে।

তাহলে কী পাল্টাতে হবে?

আপনার নিজের মন, মানসিকতা।

পরাজিত নন, বিজয়ীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামুন।

সম্মানজনক পরাজয় নয়, বরং সেঞ্চুরি পিটানোর বিশ্বাসে এগিয়ে যান সামনে।

আপনি বিজয়ী, আপনি সফল, এটা যদি নিজেই না ভাবেন, যদি নিজেকে শুরুতেই ধরে নেন পরাজিত ও নিহত, তাহলে ভাগ্য কিন্তু আপনাকে সেটাই দিবে উপহার, মহাসমারোহে।

তাই আসুক পরিবর্তন, নিজেকে মনে মনে দেখুন ফার্স্ট, বিজয়ী, সফল হিসাবে।

মাঠে নামার আগেই পরাজয়কে দিন চিরতরে নির্বাসনে।

বদলে যান, বদলে দিন

প্রথম পদক্ষেপ

স্বপ্ন দেখার কথা বহুবার বলেছি, কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবে আনতে হলে তো কোমর বেঁধে নামতে হবে মাঠে, তাই না? কিন্তু স্বপ্ন যদি হয় সুবিশাল, সেই নামাটাতেই আটকে যান অনেকে।

চীনা দার্শনিক লাও জু কয়েক হাজার বছর আগে খুব দরকারি একটা কথা বলেছিলেন,

হাজার মাইলের দীর্ঘ যাত্রার শুরুটাও কিন্তু হয় একটি মাত্র ছোট্ট পদক্ষেপ দিয়ে। (A journey of a thousand miles begins with a single step).

স্বপ্ন দেখে ফাটিয়ে ফেলুন, কিন্তু তার পাশাপাশি স্বপ্নকে দিবাস্বপ্ন করে না রেখে বাস্তবে নামুন, রাজপথে, শুরু করে দিন।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, তাদের লক্ষ্য অনেক উঁচুতে, কিন্তু কিভাবে সেখানে যাবেন, কিভাবে পৌঁছবেন, তা বুঝে উঠতে পারছেন না। কিংবা অনেকেই বলেন, তাদের উচ্চাভিলাষের আগুনে পানি ঢেলে দিয়ে বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ নিন্দুকেরা বলেছে, কোন দিনই তাদের পক্ষে সেই স্বপ্নের কাছে যাওয়া হবে না সম্ভব।

এই সবকিছুরই জবাব আসলে আছে লাও জু এর ঐ ছোট্ট কথাটায়– হাজার মাইলের যাত্রার সূচনা কিন্তু একটা পদক্ষেপেই।

ভূমিকা বাদ দিন। শুরু করে দিন। শুরু করাটাই কঠিন কাজ, কিন্তু একবার বলে লাথি মারলে যেমন গড়াতে থাকে সামনে, তেমনি একবার শুরু করে দিলে কাজ হয়ে যাবে। পুরা কাজটা বা পুরা স্বপ্নটা তো একবারে আলাদীনের চেরাগের মতো করে হবে না অর্জন, তাই মাঠে নেমে কাজের ছোট্ট একটা অংশ দিয়ে করুন শুরু, বাড়িয়ে দিন একটা পা স্বপ্নের গন্তব্যে। হোক না সে স্বপ্ন ক্যারিয়ারের, কিংবা পড়ালেখার, কিংবা বড় কিছু হবার...

ডরাইলেই ডর...

নিজেরাই পারি

বদলে যাবার প্রথম শর্ত হল নিজের উপরে নির্ভর করা।

আপনাকে আপনার চাইতে ভালো করে কি আর কেউ চেনে? যদি নাই চেনে, তাহলে আপনাকে বদলাবে কী করে?

কাজেই জীবন বদলাতে হলে শুরুতেই আপনাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বদলে যাবার, জীবন গড়ার কাজটা একজনই করবে। সেটা আপনি। অন্য কেউ নয়।

তাই নির্ভর করতে হবে নিজের উপরেই।

আমরা কী হবো, আমাদের ভবিষ্যতে কী হবে, তার অনেকটাই নির্ভর করছে আমাদের উপরেই। আমরা যদি উন্নতি চাই একটা দেশ হিসাবে, বিদেশ থেকে এসে কেউ সেটা করে দিবে না। স্পুন ফিডিং করে আমাদেরকে কেউ গেলাবে না জ্ঞান, গেলাবে না উন্নয়ন, সমৃদ্ধি।

সারা দেশের জন্য যেমন কথাটা সত্যি, ব্যক্তিগত পর্যায়েও সেটাই সত্যি।

নিজের পথ নিজে না দেখলে পস্তাবেন। পরের পরামর্শে কিছুটা আগালেও এক সময় থামতে হবে, অথবা হবে পিছাতে।

পরিবর্তনের স্বপ্নটা তাই নিজেই দেখে নিন। আজকেই।

রাস্তাটা সামনে, খোলা, আছে আপনার প্রথম পদক্ষেপের অপেক্ষাতেই...

পাছে লোকে কী বলে, তাতে কি কিছু আসে যায়?

অন্যেরা কী বলে, কী ভাবে, সেটা আমরা সবাই মাথা ঘামাই অনেক বেশি। জীবনের বড় একটা সময় কেটে যায় অন্যের মন যোগাতে।

কিন্তু একবার ভেবে দেখুন। অন্যকে খুশি করে আপনার লাভটা কোথায়?

আমার এক সহপাঠীর কথা মনে পড়ছে। ক্লাস টেস্টে আধা নম্বর কম পেলে সেটা নিয়ে শিক্ষকের সাথে আধা ঘণ্টা তর্ক করে সেটা আদায় করে এভারেস্টজয়ের হাসি নিয়ে হাজির হতো। অথচ সেটাতে আদৌ কিছু যায় আসতো না। অথবা অনেক আগে দেখা একটা সাক্ষাতকারের কথা, মেধাবী এক ছাত্র এসএসসিতে ফার্স্ট স্ট্যান্ড করায় সেকেন্ড স্ট্যান্ড করা প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রটি এসিড ছুড়ে চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল তার। অথবা সেই বাবা মার কথা, যারা নিজের ছেলেকে ফার্স্ট স্ট্যান্ড করানোর জন্য নগদ পয়সা দিয়ে প্রশ্ন ও পরীক্ষক কিনে ছেলেটাকে প্রথম বানিয়ে দিয়েছিল। এই যে ইঁদুর দৌড়, তার দীর্ঘমেয়াদী লাভটা কী?

আমাদের জীবনের এইসব ক্ষণিক "সাফল্য" দীর্ঘমেয়াদে কাজে আসে কমই। আমার স্কুলের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাস্ট বয় আর ফার্স্ট বয়ের মাঝে পেশাগত সাফল্যের পার্থক্যটা আদৌ উল্লেখযোগ্য না। সেই যে আধা নম্বর প্রত্যাশী আঁতেল ছাত্রটি, সে সেই আধা নম্বরের জোরে দুনিয়া পাল্টে দেয়নি, বা তার চাইতে আধা কিংবা ১০ নম্বর কম পেয়ে কেউ পথে বসেনি জীবনের যাত্রায়।

অন্যেরা কী বলবে, পাছে লোকে কিছু বলবে, এই ভয়ে এই আতঙ্কে ইঁদুর দৌড়ে দৌড়ানো অর্থহীন। নোবেলজয়ী প্রখ্যাত পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান তাঁর বইতে একটা কথা বার বার উল্লেখ করতেন, নিজের ক্যারিয়ার বা কাজ সম্পর্কে সহকর্মী বা সহপাঠীদের মূল্যায়ন নিয়ে ফাইনম্যান যখন টেনশন করতেন, তাঁর ক্যান্সারাক্রান্ত স্ত্রী এই কথাটি তাকে বলেছিলেন। কথাটা হল–

What Do You Care What Other People Think?

Memento mori– আমরা সবাই মরণশীল, এই সুন্দর জীবনের যতটুকু পাই, তাই আমাদের লাভ, সেই সময়টা অন্যদের জাজমেন্টের ভয়ে গুটিয়ে না থেকে, অন্যদের প্রশংসা কিংবা নিন্দার ভয় বাদ দিয়ে, উপভোগ করে নিন, ইঁদুর দৌড়ে না দৌড়ে, আধা নম্বরের জন্য মাথা না ঘামিয়ে এগিয়ে যান জীবনের জয়গান গেয়ে, সবার জীবনকে আলো করে দিয়ে।

খাইট্টা খা!!

স্কুল বা কলেজের অনেক কিশোর তরুণ শিক্ষার্থী পড়ালেখার ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে মেইল করে। একাডেমিক পড়াশোনা বা যেকোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হলে আসলে উপরের এই সামান্য কিন্তু অসামান্য পরামর্শটাই যথেষ্ট।

ম্যালকম গ্লাডওয়েলের Outliers বইটাতে এই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বিশদভাবে। মোদ্দা কথাটা তাঁর এমন– যেকোনো বিষয়ে বিশ্বমানের দক্ষতা অর্জন করতে হলে ১০ হাজার ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয়, অনুশীলন করতে হয়। মোজার্ট কিংবা বিটোফেন এর মতো সঙ্গীতজ্ঞ থেকে শুরু করে বিশ্বসেরা দাবা বা টেনিস খেলোয়াড়, তারা অনেকেই এমন করে সময় নিয়ে পরিশ্রম করে অনুশীলন করে তবেই হয়েছেন বিশ্বসেরা।

আমার নিজের পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দেই। এইচএসসি পরীক্ষায় গণিতের ক্যালকুলাস অংশ নিয়ে বেশ ভালো সময় লাগতো, সময়ের অভাবে শেষ করতে না পারার অবস্থা ছিল। পরীক্ষার আগের ৪ মাস ধরে দিনে এক ঘণ্টা অনুশীলন করে এমন দক্ষতা অর্জন করেছিলাম যে ১০ মিনিটে সেই অংশটা শেষ করতে পারতাম। (দুঃখজনক, পরে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গিয়ে সেই দক্ষতা গায়েব হয়ে যায় গণিত বিভাগের বস্তাপচা অংক মুখস্থ করানোর প্রবণতার জন্য, এখনো আফসোস সে নিয়ে)।

স্কুলের এসএসসির ফল দিবে অল্প কয়দিন পরে, অনেকেই আবার কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবে অনেকে, কিন্তু সেটা ছাড়াও কোন না কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের হবে দরকার। সেজন্য করো অনুশীলন, সময় নিয়ে, দিয়ে মনোযোগ। ১০ হাজার না হোক, হাজার খানেক ঘণ্টা দিতে হবে কিছু শিখার মতো করে শিখতে হলে ...

জীবনে বহুদূর যেতে হলে নাই কোন শর্টকাট ... খাইতে হলে সেটা করতে হবে খাইট্টাই। আপনার স্বপ্নকে সফল করতে হলে এইটা আপনাকে

স্বীকার করে নিতে হবে। দরকার হলে কাগজে লিখে দেয়ালে রাখুন লাগিয়ে। স্বপ্নটাকে বাস্তবের পৃথিবীতে নামিয়ে আনার প্রস্তুতি নিন মনে মনে, আর হাজার কয়েক ঘণ্টা সেজন্য খাটুন।

স্বপ্নটা পালাবে কোথায়?

না শব্দটা ব্যান করে দিন জীবন থেকে

জীবনে অনেক সুযোগ, অনেক কিছুই আসে কাকতালীয়ভাবে। অন্যদের কথা জানি না, কিন্তু আমার জীবনের প্রতিটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখা ঘটনা কাকতালীয়ভাবেই হয়েছে। আমার এক ছাত্র একবার জানালো, তাকে এক কোম্পানি ইন্টারভিউ এই সপ্তাহে দিতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করায় সে বলেছে, এই সপ্তাহে পরীক্ষা, তাই পরের সপ্তাহে সময় পেলে সে যাবে। তাকে বোঝালাম, সুযোগ জীবনে একবারের বেশি আসবে না, বাকির নাম ফাঁকি। ছাত্রটি আমার কথা শুনেছিল, সেই সপ্তাহেই ইন্টারভিউ দেয়াতে পেয়েছে ভালো চাকরিটাও।

তাই "না" বলা বাদ দিন। কাকতালীয় সুযোগ জীবনে আসবে একবারই হয়তো, সিনেমার সেই গল্পের মতো ট্রেনটা চলে গেলে আফসোস করবেন সারা জীবন, তাই সিদ্ধান্ত নিন ঝটপট, চড়ে বসুন ট্রেনে, নিন দ্রুত পদক্ষেপ, আর দেখুন স্বপ্ন।

সাহিত্যিক মার্ক টোয়েনের ভাষায়–

"Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do, so throw off the bowlines, sail away from safe harbor, and catch the trade winds in your sails. Explore, Dream, Discover."

না শব্দটা ব্যান করে দিন জীবন থেকে

জীবনে অনেক সুযোগ, অনেক কিছুই আসে কাকতালীয়ভাবে। অন্যদের কথা জানি না, কিন্তু আমার জীবনের প্রতিটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখা ঘটনা কাকতালীয়ভাবেই হয়েছে। আমার এক ছাত্র একবার জানালো, তাকে এক কোম্পানি ইন্টারভিউ এই সপ্তাহে দিতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করায় সে বলেছে, এই সপ্তাহে পরীক্ষা, তাই পরের সপ্তাহে সময় পেলে সে যাবে। তাকে বোঝালাম, সুযোগ জীবনে একবারের বেশি আসবে না, বাকির নাম ফাঁকি। ছাত্রটি আমার কথা শুনেছিল, সেই সপ্তাহেই ইন্টারভিউ দেয়াতে পেয়েছে ভালো চাকরিটাও।

তাই "না" বলা বাদ দিন। কাকতালীয় সুযোগ জীবনে আসবে একবারই হয়তো, সিনেমার সেই গল্পের মতো ট্রেনটা চলে গেলে আফসোস করবেন সারা জীবন, তাই সিদ্ধান্ত নিন ঝটপট, চড়ে বসুন ট্রেনে, নিন দ্রুত পদক্ষেপ, আর দেখুন স্বপ্ন।

সাহিত্যিক মার্ক টোয়েনের ভাষায়–

"Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do, so throw off the bowlines, sail away from safe harbor, and catch the trade winds in your sails. Explore, Dream, Discover."

আত্মোপলব্ধি– আয়নায় নিজের মুখ...

ক্লাস সিক্সে পড়ার সময়ে স্কুলের দেয়াল পত্রিকার জন্য লেখা চাওয়া হয়েছিল সহপাঠী একজন নিয়ে এলো অসাধারণ এক গল্প, চমৎকার ভাষানৈপুণ্য, আর অভাবনীয় পরিসমাপ্তি, সব মিলে খুবই সুন্দর। কিন্তু সে গল্প আমার সেই সহপাঠী ক্লাস সিক্সের ছেলেটা লিখেনি, লিখে দিয়েছে তার গৃহশিক্ষক, আর ক্রেডিট পাবার মোহে সেটা সে জমা দিয়েছে নিজের নামে।

এই শর্টকাট প্রবণতার দীর্ঘমেয়াদী ফল শূন্য, কিংবা ঋণাত্মক। আমার সেই সহপাঠী হয়তো নিজে চেষ্টা করলে কাঁচা হাতের লেখায় গল্প/কবিতা লিখে হাত মকশো করতে পারত, এক দিনে রবীন্দ্রনাথ হতে না পারুক, লিখতে থাকলে এক সময়ে হতো লেখক কিংবা ব্লগার। কিন্তু হয়ে গেলো ক্ষণিকের বাহবা পাওয়া লেখা-চোর।

পর্বতে ওঠা থেকে শুরু করে নানা ব্যাপারে "প্রথম" হওয়া– দেশে আজ চলছে যেসব গরমগরম বিতর্ক, তাদের অধিকাংশেরই মূলে আছে সততা ও নৈতিকতার অভাব। বিতর্ক বাদ দিন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও নিয়ম না মেনে চলা, শর্টকাট খোঁজা, এসবের কারণে ব্যক্তিগত সুবিধা হলেও সামষ্টিকভাবে আমাদের সমাজের, দেশের অনেক সমস্যা, অনেক পিছিয়ে থাকার পরম্পরা থেকে যাচ্ছে।

অন্যের দোষ ধরা, বদনাম করা, – এসবের আগে তাই আসুন, আয়নায় দেখি নিজের মুখ, নিজে হই সৎ, নিজে মেনে চলি নিয়ম। শর্টকাট দেই বাদ, লাইন টপকে আগে "সিস্টেম" করে ঢোকার বদলে ধরি ধৈর্য।

নিজের কাজটা করি ঠিকমতো, ভবিষ্যত প্রজন্মকে দেই সততা, নীতি মেনে চলার শিক্ষা।

আমাদের দেশটা, সমাজটা পাল্টে যাবে, রাতারাতি।

বুঝে নিন জীবনের সহজ ফরমুলা

জীবনটাকে পাল্টাবার জন্য কি আলাদীনের চেরাগ লাগবে? সে না হয় গল্পে মেলে। বাস্তবে জীবন পাল্টাবার সহজ ফরমুলা বলে কি কিছু আছে?

জ্বি হ্যাঁ, আছে। খুব সহজ সে ফরমুলাটা। চুপি চুপি বলে দেই সেটা এখানে–

"Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning."

কথাটা যিনি বলেছিলেন, স্কুলে পড়ার সময়ে বোকাসোকা হিসাবে বদনাম হয়েছিল, পছন্দের ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন, পরে আন্ডারগ্রাজুয়েট শেষ করার পর দুই বছর চাকরি না পেয়ে ছিলেন বেকার, তার পর এক অফিসে কেরানির চাকরি করছিলেন।

তার নামটা পরে বলব, কিন্তু কথাটা ভেবে দেখুন। সবার আগে বাঁচুন, গতকাল থেকে নিন শিক্ষা, আর স্বপ্ন দেখুন ভবিষ্যতের, হয়ে থাকুন চির কৌতূহলী! খুব সহজ কথায় জীবনের ফরমুলা।

জীবনের সহজ ফরমুলা দেয়া এই ভদ্রলোকটার নামটা কী? আন্দাজ করতে পেরেছেন?

আলবার্ট আইনস্টাইন

আইনস্টাইনের $E=mc^2$ নয়, এই ফরমুলাটাই হয়তো আপনার জীবনের কাজে আসবে সবচেয়ে বেশি। শিখুন, জানুন, প্রশ্ন করুন। আর আশা ও স্বপ্ন রাখুন মনের মাঝে।

স্বপ্ন দেখুন, প্রশ্ন করুন। করতেই থাকুন।

সহজ তো, সহজ না?

থাকুন কৌতূহলী হয়ে, সব সময়েই

স্বপ্ন দেখার জন্য জানতে হবে পরিশ্রম করতে হবে, তা নাহয় বুঝলেন, কিন্তু স্বপ্ন দেখার অনুশীলন করবেন কিভাবে? উপায় আছে, আছে বটে।

তবে সেজন্য আপনাকে একটু স্বপ্নবাজির প্রাকটিসে নামতে হবে, মনকে দিতে হবে খুলে, আর হতে হবে কৌতূহলী। একটা গল্প শোনা যাক।

দুই গ্লাস পানি নেন, একটা গরম পানি, আরেকটা ঠাণ্ডা। এবার দুইটাকেই ফ্রিজে রাখেন, বরফের অংশে।

কোন গ্লাসটার পানি আগে বরফ হবে বলে মনে হয়?

নাহ, যেটা ভাবছেন, সেটা ভুল, কমন সেন্সে যদি ভেবে থাকেন ঠাণ্ডা পানিটাই আগে জমবে, তাহলে ভুল, কারণ অভাবনীয় হলেও সত্যি, গরম পানিটাই আগে জমে বরফ হবে।

পৃথিবীর ও বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক অনেক মহা আবিষ্কার হলেও এই ঘটনাটা কেউ খেয়াল করেনি, বা করেনি এ নিয়ে গবেষণা, কিন্তু আফ্রিকার এক স্কুলছাত্র এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করেন। সেই মপেম্বার নামানুসারেই এই ঘটনাটাকে বলাহয় মপেম্বার এফেক্ট বা মপেম্বার ক্রিয়া।

আর্নেস্টো মপেম্বা (Mpemba)। বাড়ি আফ্রিকার তানজানিয়াতে। ১৯৬৩ সালে স্কুলের রান্নার ক্লাসের জন্য আইসক্রিম বানানো শিখছিলেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন, গরম দুধের গ্লাসটাই ঠাণ্ডা দুধের চাইতে আগে জমছে। পানি নিয়ে একই ঘটনা দেখলেন। শিক্ষক ও বন্ধুদের সেটা বলাতে তারা পাগল খেতাব দিল। কেটে গেলো কয়েক বছর। ইংরেজ এক পদার্থবিদের এক লেকচার দেখতে গিয়ে আর থাকতে না পেরে লেকচারের শেষে তাকে প্রশ্ন করলেন। ড. অসবোর্ন নামের এই বিজ্ঞানীও বিশ্বাস করেননি প্রথমে, কিন্তু পরে হাতেনাতে দেখতে পেলেন এই ব্যাপারটা। পরে ১৯৬৯ সালে এক জার্নালে তিনি আর মপেম্বা মিলে লিখলেন এই ঘটনাটাকে নিয়ে একটি গবেষণাপত্র। সেই থেকেই এই ঘটনা বা ক্রিয়াটির নাম মপেম্বা এফেক্ট (Mpemba Effect)।

কেন এরকম হয়? এর ব্যাখ্যা দেয়াটা এখনো বেশ কঠিন। ধারণা করা হয়, এর কারণ হল গরম পানি থেকে দ্রুত পানি বাষ্পীভূত হওয়া, পরিচলন, আর সুপারকুলিং সহ আরো কিছু ঘটনার সংমিশ্রণ।

তবে আমার পয়েন্টটা অন্য– দুনিয়াতে অনেক অজানা অনেক নতুন কিছু আছে– সবকিছু এখনো আবিষ্কার হয়ে যায়নি, হতে পারে দৈনন্দিন জীবনে আপনিও নতুন কিছু এভাবে জানতে পারেন, মপেম্বার মতোই।

থাকুন চিরকাল হয়ে কৌতূহলী। আপনার-আমার কৌতূহলই চালিয়ে নেয় নতুন কিছু দেখার জানার সব স্বপ্নকে। আপনার স্বপ্ন নিজেকে নিয়ে হলেও সেই স্বপ্নকে সমৃদ্ধ করতে হলে হয়ে পড়ুন সুতীব্র কৌতূহলী, চোখ মেলে দেখুন সবকিছুকে। স্বপ্নের জগতটাকে গড়ে তুলতে পারবেন এভাবেই।

শেখার বয়স, বয়সের শেখা

নতুন কিছু শেখার, জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে নতুন করে ক্যারিয়ার শুরু করার কি কোন বয়স আছে?

আপনাদের অনেকের হয়তোবা জীবন চলেছে আঁকাবাঁকা পথে, সেখান থেকে স্বপ্নের দিকে জীবনের মোড় ঘুরাতে হলে শিখতে হবে নতুন কিছু। সেটার ভয়ে কি যাচ্ছেন পিছিয়ে? ভাবছেন নতুন কিছু শেখার, স্বপ্ন দেখার বয়স আর নাই?

তাহলে ছোট্ট একটা গল্প বলি। ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় এট আরবানা শ্যাম্পেইনে আমি যখন পিএইচডি করতে যাই, তখন পাশের ল্যাবে একজন চীনা প্রফেসরকে দেখি, প্রফেসর জিয়াওয়ে হান (Jiawei Han)। অত্যন্ত স্বল্পভাষী এই অধ্যাপককে দেখে বোঝার উপায় নাই, কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ শাখা ডেটা মাইনিং (Data mining) এর জনক হিসাবে সারা বিশ্বে তাঁর খ্যাতি। তো, আমাদের এক সেমিনারে একদিন উনি তাঁর নিজের গল্প বললেন, উনি নাকি ৩২ বছর বয়সে পিএইচডি শুরু করেছিলেন।

ব্যাপার কী? ষাটের ও সত্তরের দশকে চীনে হয়েছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মতো অভাবনীয় এক কাণ্ড, যেসময় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বা ছাত্রদের সবাইকে ধরে বেঁধে গ্রামে পাঠিয়ে চাষবাসের কাজে লাগিয়েছিল কমিউনিস্ট সরকার। ভাবখানা, জ্ঞান-বুদ্ধি এগুলোর মতো শয়তানী কাজ কারবার ঠেঙ্গিয়ে দূর করা। সেসময় মেধাবী ছাত্র জিয়াওয়েই হান এভাবে ১০ বছর গ্রামের ক্ষেত খামারে কাজ করে কাটান। তার পর ১৯৭৭-৭৮ সালের দিকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যুগ শেষ হলে শহরে ফিরে আবার পড়াশোনা করার সুযোগ পান। তার পর ১৯৭৯ সালে ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা শেষ করতে পারেন। সেসময় প্রথম কিছু চীনা গবেষক আমেরিকাতে পিএইচডি করতে যেতে পারে, ৩২ বছর বয়সে সেভাবেই

তিনি শুরু করেন পিএইচডি, সেটা পান ৩৬ বছর বয়সে, আর তখনই শুরু করতে পারেন তাঁর ক্যারিয়ার।

বয়স ৪৫ হবার পরেই তিনি তাঁর আসল কাজটা শুরু করেন, আর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ৫০ বছর পেরবার পরে। এখন উনার বয়স ৬৫, সারা বিশ্বের সেরা কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখন তিনি শুরুর দিকেই আছেন।

তো, এই গল্পটা বলার উদ্দেশ্যটা কী? উদ্দেশ্যটা হল এটা বোঝানো, নতুন কিছু শেখার জন্য, শুরু করার জন্য বয়স কোন বাঁধা না। আপনার বর্তমান ক্যারিয়ারে আটকে গেছেন, এগোতে পারছেন না? শুরু করে দিন নতুন কিছু। যেটাতে আপনার আগ্রহ আছে, প্রেরণা আছে। হতে পারে আপনি এই বিষয়ে ডিগ্রি পাবেন না, কিন্তু শিখতে তো সমস্যা নাই, তাই না? এবং ভালো করে কাজ শিখে ক্যারিয়ার পাল্টাতেও তো সমস্যার কিছু নাই। সংকোচ লাগছে? ধুর, এই ফালতু সংকোচকে ছেড়ে ফেলে এগিয়ে যান। পাছে লোকে কিছু বলে শোনার কোন ই দরকার নাই।

কাজেই বয়সের জন্য যাবেন না পিছিয়ে। কোন কিছু শেখার বা শুরু করার নাই কোন বয়সের সীমা– শুরু করে দিন।

শেষ করছি আলফ্রেড মন্টেপার্টের একটা উক্তি দিয়ে,

“নতুন কোন সমস্যা ধরো,

সকাল বিকাল নাস্তা করো”

(ইংরেজিতে Expect problems and eat them for breakfast”)

শুরুটা করে দিন। আজকেই...

সেকেন্ড চান্স

জীবনে সব কিছু চলে না সব সময় সরল রেখায়, বিশেষ করে পড়ালেখার ক্ষেত্রে এটা হাড়ে হাড়ে সত্যি। অসুখে কিংবা কোন দুর্ঘটনায় অনেক সময়েই প্রথমবারে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলে না, পড়া হয় না হয়তো পছন্দের বিষয়টা। কিন্তু দুঃখজনক হল, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সেকেন্ড চান্সের কোন ব্যবস্থাই নাই।

শুরুটা হয় স্কুল থেকেই। কোন বিষয়ে কম নম্বর পেলে বন্ধ হয়ে যায় হয়তো বিজ্ঞান পড়ার রাস্তা। বায়োলজি না পড়লে পরে আর পড়া যাবে না চিকিৎসা বিজ্ঞান। অথবা এসএসসিতে বাণিজ্য বা কলা শাখায় পড়লে সারা জীবনের জন্য বন্ধ বিজ্ঞান পড়ার রাস্তা। সেই স্কুল জীবনের একটা পরীক্ষার কারণে সারা জীবনেই থাকে স্বপ্নের দরজাটা বন্ধ।

অথচ এমনটা কি হতে পারে না, প্রত্যেকেই পাবে আরো সুযোগ? দরকার হলে বেসিক প্রিরিকুইজিট পরে পড়ে নিয়ে বাণিজ্যের ছাত্ররাও পারবে পড়তে কম্পিউটার বিজ্ঞান? বা বায়োলজিতে পড়াশোনা করে পরে পড়তে পারবে প্রকৌশল?

বাংলাদেশী একজন চিকিৎসক আমাদের প্রতিবেশী, ভদ্রমহিলার ব্যাকগ্রাউন্ড শুনে হয়েছিলাম বিস্মিত, উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে পরে আমেরিকাতে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার সাইন্সে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স করেছিলেন। বহু বছর প্রকৌশলী হিসাবে নাসায় কাজ করেছেন, তার পর ৪৫ বছর বয়সে হঠাত চাকরি ছেড়ে দিয়ে মেডিকেল কলেজে হলেন ভর্তি, তার পর আমেরিকার মেডিকাল সিস্টেমের সবটা আবার পেরিয়ে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। আমার ইউনিভার্সিটির মেডিকাল সেন্টারের বিজ্ঞাপনে উনার ছবি দেখানো হয়, এমনই খ্যাতি।

এই যে যাঁর কথা বললাম, তিনি কিন্তু দ্বিতীয় সুযোগ পেয়েছিলেন ক্যারিয়ারে, সেইরকম সুযোগ আসলে সবারই প্রাপ্য। আমার এক

সহকর্মীর স্নাতক পর্যায়ের পড়াশোনা সঙ্গীতে, কিন্তু পরে পড়েছেন কম্পিউটার বিজ্ঞান, হয়েছেন সেটার অধ্যাপক। সুযোগটা ছিল উন্মুক্ত, তাই পছন্দের বিষয়ে পেরেছেন যেতে।

আমাদের দেশের শিক্ষা ও অন্যান্য জায়গায় তাই চাই দ্বিতীয়বার সুযোগ পাবার সুযোগ। কৈশোর বা ছাত্রাবস্থার একটামাত্র পরীক্ষা জীবনের সব দরজা বন্ধ করে দিবে, সেটা তো হতে পারে না, তাই না? আর ট্র্যাক পাল্টানো, পড়াশোনার বিষয় পাল্টানো, সেটার জন্যও চাই যথেষ্ট সুযোগ।

আর সেই সুযোগ দরকার হলে করে নিন নিজেই। আপনার মনকে বোঝান, সেকেন্ড চান্স আপনারও প্রাপ্য, আর আপনি সেটা পাবেনই। শেষ বলে কিচ্ছু নেই দুনিয়াতে, সেকেন্ড চান্সে জীবন পাল্টাতে বহু মানুষ পেরেছে, আপনিও পারবেন। অবশ্যই পারবেন।

স্বপ্নে, বাস্তবে সবাই পাক সেকেন্ড চান্স, জীবনকে পাল্টে দেয়ার অমোঘ সুযোগ...

অসম্ভবকে সম্ভব করাই...

অসম্ভবকে সম্ভব করাই কী অনন্ত জলিলের কাজ?
নাহ।
অসম্ভবকে সম্ভব করা আসলে "আপনার" কাজ।
"তোর দ্বারা এটা হবেই না"
"এটা তোমার পক্ষে করা অসম্ভব!!"
"তুমি পারবে না কখনোই"

এই কথা গুলো চেনা লাগে? জীবনে শুনেছেন নিশ্চয়ই কখনো? কারণ অন্যের বেলায় হাত খুলে পরামর্শ বিলানো মানুষের অভাব নাই, আর তাদের ভাণ্ডারে ঋণাত্মক কথারও নাই কোন অভাব।

এদের জন্য উপযুক্ত জবাব কী?

গদাম?

নাহ, হাতেনাতে গদামের দরকার নাই, সবচেয়ে বড় গদাম হয় যখন সেই কাজটা করে বিজয়ীর হাসিটা সেই না-না-বলা মানুষটাকে দেখাতে পারেন।

এক সময়ে বলা হতো আকাশে পাখির মতো ওড়া অসম্ভব।

বলা হতো, চাঁদে যাওয়া কল্পনা মাত্র।

একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ নির্ঘাত বলেছিল, সুসজ্জিত পাকিস্তানি সেনাদের সাথে লড়ে জেতা অসম্ভব।

অথবা বাংলাদেশের টেস্ট খেলা, দুনিয়ার অন্য প্রান্তের মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলা, সব অসম্ভব!

কিন্তু আজ?

সেভাবেই ব্যক্তিগত জীবনেও অসম্ভবকে সম্ভব করা সম্ভব, তার জন্য অনন্ত জলিল কিংবা সুপারম্যান লাগবে না, কারণ আপনি নিজেই একজন সুপারম্যান বা সুপারওমেন, অসম্ভবসম্ভবকারী, অঘটনঘটনপটিয়সী।

কেবল, নিজেকে বিশ্বাস করুন, নিজের উপরে রাখুন আস্থা। অসম্ভব-বলিয়েরা আপনাকে সেভাবে চিনে না, যেভাবে আপনি চিনেন নিজেকে।

তাই আজকেই বলুন, আজকেই সময় বলার, “অসম্ভবকে সম্ভব করাই, “আমার কাজ”।

অনন্ত জলিল নিজে একটা অসম্ভব কাজ করছেন, নানা বিদ্রূপের মুখেও মাথা ঠাণ্ডা করে নিজের কাজটা করে যাচ্ছেন। উচ্চারণ নিয়ে যতোই হাসি না কেন আমরা, অনন্ত নিজের কাজে অসম্ভবের পিছনে আছেন, সেটাকে জানাই সালাম।

একলা নয়, একসাথে চলো রে

রেডিওতে শুনছিলাম একটা অনুষ্ঠান, মাইক্রোসফটের শীর্ষস্থানীয় এবং খুব উঁচু পদে এক সময়ে ছিলেন, এমন একজনের সাক্ষাতকার। মিলিয়ন ডলারের সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি এখন একেবারে ২/৩ বছরের বাচ্চাদের স্কুলে পড়ান, আর দুঃস্থদের খাবার দেয়ার সাথে জড়িত একটি দাতব্য সংস্থা চালান। বিশাল গ্লাস ওয়ালে ঘেরা অফিসের বদলে তাঁর এখন খুপরির মতো একটি ছোট্ট অন্ধকার অফিস, কিন্তু মনে প্রগাঢ় প্রশান্তি।

এই ভদ্রমহিলার যে কথাটি খুব পছন্দ হল, সেটা এই নিচের প্রবাদটি, আফ্রিকায় চালু এই প্রবাদটা এরকম...

"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together."

অর্থাৎ, একলা চলে যাওয়া যায় দ্রুত, কিন্তু সবাইকে নিয়ে, সবার কথা ভেবে যাওয়া যায় বহুদূর।

কী অসাধারণ কথা, কী চমৎকার অনুভূতি!!

এবার নিজের গন্তব্যের কথা, নিজের স্বপ্নের কথা ভাবুন।

আপনার স্বপ্ন কি অনেক দূর বিস্তৃত? নাকি শর্টকাট? স্বপ্নের জীবনটা যদি খুব হাতের নাগালে হয়, তাহলে হয়তোবা আপনি স্বপ্নই দেখছেন না ভালো করে, বাস্তবটাকেই আঁকড়ে আছেন বসে। বহু দূর বহু রঙের স্বপ্নের দিশা হাতে নাগালে পেতে হলে আফ্রিকার সেই প্রবাদটার কথা মনে রাখুন সব সময়ে।

একা নয়, স্বপ্ন দেখুন সবাইকে নিয়ে, আর স্বপ্নের জীবনের পানে যেতে হলে সবাইকে নিয়েই চলুন পথ।

গ্যারান্টি দিচ্ছি, সবাইকে নিয়ে গেলে, বহু দূরের সেই স্বপ্নটার নাগাল পাবেনই পাবেন। অবশ্যই পাবেন।

তাই একসাথে চলুন, স্বপ্নের নতুন জীবনের সন্ধানে।

Yes, and...

শিক্ষক.কম এর পক্ষ থেকে গুগলের RISE পুরস্কার গ্রহণ করতে ২০১৩ সালের গ্রীষ্মে গিয়েছিলাম লন্ডনে। ১৮টি দেশের জ্ঞান-ভিত্তিক প্রজেক্টকে এই পুরস্কার দেয়ার পাশাপাশি গুগল আমাদের ২ দিন ধরে নানা রকমের দিয়েছিল ট্রেনিং, তার মধ্যে একটা সেশনে ছিল কিভাবে একটা টিম বা কার্যকর দল হিসাবে কাজ করা যায়, ব্রেইনস্টর্মিং করে বের করা যায় দারুণ সব আইডিয়া।

এক কাজের উপরে যখন অনেক জনের দল একসাথে কাজ করতে যায়, শুরুতেই যে সমস্যাটা হয় তা হল নানা মুনির নানা মত। কেউ বলে এইভাবে করতে হবে, আবার অন্য কেউ বলে ঐভাবে। বসের ভয়ে হয়তোবা অনেকে কথাই বলে না, খালি সায় দিয়ে যায়। কিন্তু টিম স্পিরিট, সবার মাঝে সম্পর্ক, আর ভালো ব্রেইনস্টর্মিং এর জন্য এইটা একেবারেই খারাপ একটা ব্যাপার।

দলগত ভাবে কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে তাই যেটা কার্যকর, সেটা হল Yes, and টেকনিক। গুগলের ট্রেনিং টিম আমাদের এভাবেই শিখিয়েছিল। টেকনিকটা খুব সহজ। ব্রেইনস্টর্মিং বা মাথা ঘামিয়ে আইডিয়া বের করার মিটিং এ সবাই কিছু না কিছু বলবে। কিন্তু কেউ কোন আইডিয়া দিলে পরের জন সেটাকে নাকচ করে দিতে পারবে না সরাসরি। "No", "But" এই শব্দগুলো একেবারেই নিষিদ্ধ। তার বদলে পরের জনকে শুরু করতে হবে "Yes, and" অর্থাৎ "ঠিক আছে, আর এর পাশাপাশি আমরা ...।" এই রকমভাবে।

উদাহরণ একটা দেই ... ধরা যাক ভালো ফল কোনটা তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

দবির: আম খেতে খুব মজা।

ছবির: Yes, and.... জাম খেতেও খুব মজা।

খবির: Yes, and, কাঁঠাল খুব ভালো ফল।

এভাবে আলোচনা করলে এক সময় ভালো ফলের তালিকা বেরুবে। কিন্তু ধরুন ছবির যদি এখানে বলতো, "ধুর, আম একটা ফল হল? ফলের রাজা জাম", আর খবির বলতো, "তোরা দুইটাই বেক্কল, কাঁঠাল হল আসল ফল", তাহলে কি টিম হিসাবে দবির-খবির-ছবিরের ভবিষ্যত খুব ভালো হবে?

আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাপারটা অনেকটা কমেডির মতো শোনালেও টিম স্পিরিট গড়তে এই স্ট্র্যাটেজি খুব কাজের, কারণ আপনি আপনার টিমমেটকে করছেন সম্মান, আর তার পাশাপাশি নিজের মতটাও জানাচ্ছেন।

কেবল কাজে নয়, পড়াশোনা, জীবন, সবখানেই এই টেকনিকটা লাগবে কাজে। তাই আর দেরি কেন, আজ থেকে "কিন্তু", "না", "তবে", "হবে না" এসব বলা বাদ দিন, বরং পজিটিভ হন, বলুন, "হ্যাঁ", "অবশ্যই", "বিলক্ষণ", "আলবত" ...

Yes, and....

নোয়াখালীর রবীন্দ্রনাথ, আপেক্ষিক ভালোলাগা, আর suum cuique pulchrum est

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বদলে আপনার কি ভালো লাগে পপ মিউজিক? অথবা তারাশংকরের বদলে হুমায়ূন আহমেদের গল্প? এজন্য কি আপনি লজ্জিত? আপনি কি শুদ্ধ শান্তিপুরী বাংলার বদলে চট্টগ্রামের টানে কথা বলে বন্ধু মহলে গাঁইয়া বলে পরিচিত?

"ভালো", "সংস্কৃতিমনা", "শুদ্ধ"– এই সব শব্দগুলো আপেক্ষিক। "To each his own is beautiful"– যার যারটা তার তার কাছে। গজল না শুনে পল্লী গীতি শুনলে অথবা নজরুলগীতির বদলে যদি গুরু আজম খানের গানে হন উদ্বেলিত, আপনি কি সংস্কৃতিমনা নন? কেন হবেন না?

"শুদ্ধ" বলে যেমন কোন ভাষা নাই, আছে কেবল প্রমিত, তেমনি শুদ্ধ সংস্কৃতি বলেও কিছু নাই। কোনটা কার ভালো লাগবে, তার ব্যাপার। ভালো লাগার উপরে জোর করা নাই, পছন্দের উপরে চোখ রাঙানো খাটে না, কাজেই চিরায়ত ক্লাসিক সাহিত্য কর্ম ভালো না লেগে যদি মাসুদ রানা পড়ে ভালো লাগে, কেন হবেন কুণ্ঠিত?

আমাদের প্রত্যেকের সৌন্দর্যবোধ নিজের নিজের, অন্যের কিছু ভালো লাগলে আপনার ভালো লাগতে হবে, লাগাতে হবে জোর করে, এই ভাবনাটা তাই বাদ দিন। জীবন বার বার আসবে না, এই জীবনটা তাই যদি অন্যের পছন্দ জোর করে গিলে দেন কাটিয়ে, তাহলে নিজের সাথেই হবে প্রতারণা।

তাই মন খুলে ভালো লাগান, যেটাকে ভালো লাগে, সেটাকেই। নিজের ভাষাকে নিয়ে লজ্জিত হবার কিছু নাই, রবীন্দ্রনাথ নোয়াখালী বা সিলেটে জন্মালে নোয়াখাইল্লা বা সিলটি ভাষাকে নিয়েই "বিদগ্ধ"

লোকজনের বিগলিত আবেগ প্রকাশিত হতো, আর হয়তো শান্তিপুরী ভাষাটা হতো অচ্ছুত।

জীবনটা কাটান নিজের মতো করেই, নিজের ভালো লাগাকে নিয়ে।

To each his own, মূল লাতিন ভাষায় suum cuique... ভালো লাগাটাকে রাখুন নিজের করে ...

সাধারণের অসাধারণত্ব

কোন কাজ করতে গিয়ে থেমে যাচ্ছেন "বিশেষজ্ঞ"দের কথা শুনে? ভয় পাচ্ছেন, পিছিয়ে যাচ্ছেন কারো "হবে না", "পারবে না" এরকম রায় দেখে?

"আম জনতা" বলে একটা শব্দ আমরা চালু করেছি। মানুষ যেন দুই রকমের– সেলিব্রেটি অসামান্যেরা, আর আম-জনতা। আর আমাদের মিডিয়া, জনমনে, সবখানে চলে এই অসাধারণদের গল্প, সবাই জয়জয়কার করি তাদের নিয়ে। মেনে নেই তাদের সব অভিমত।

কিন্তু সাধারণেরা কি অসামান্য নন? অসাধারণেরা কি সমালোচনা, হিসাবের বাইরে? প্রশ্নের ঊর্ধ্বে? তাদের কথাই বেদবাক্য, আম জনতার তাকে প্রশ্ন করা মানা?

জটিল আলোচনায় না গিয়ে বিজ্ঞানের জগত থেকে তিনটা গল্প শোনা যাক।

আজ থেকে ১২০ বছরের মতো আগে কিছু পাগলাটে মানুষের মাথায় ভুত চেপে ছিল, তারা আকাশে উড়তে চায় পাখির মতোই। বিজ্ঞ বিজ্ঞানী অসামান্য অসাধারণেরা কী রায় দিয়েছিলেন? সেসময়কার ডাকসাইটে বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন বলে দিলেন, "বাতাসের চাইতে ভারি কোন কিছু কক্ষনো উড়তে পারবেনা"। মানে বেলুন ছাড়া ওড়াটা অসম্ভব। এরকম বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের কথা শুনে অনেকেই থেমে গেলেন, কিন্তু দুই সাধারণ সাইকেল মিস্তিরি ভাই উইলবার রাইট আর অরভিল রাইট কিন্তু থামেননি, নিজেদের উদ্যোগে বানিয়ে ফেললেন প্রথম উড়োজাহাজ, সেটা আকাশে উড়ে প্রমাণ করে দিল সাধারণ মানুষের অসাধারণত্বকে।

আরো বছর ২০ পরের কথা। রবার্ট গডার্ড নামে এক ক্ষ্যাপাটে বিজ্ঞানী সবাইকে বলে বেড়ান রকেটে করে মহাকাশে যাবার স্বপ্নের কথা। তাকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে, এমনকি একবার বিখ্যাত পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমসের সম্পাদক বলে বসলেন, "প্রফেসর গডার্ড ক্রিয়া-

প্রতিক্রিয়ার সূত্রটাই জানেন না, হাইস্কুলে যা পড়ানো হয়, সেটাও তিনি ভুলে বসেছেন, মহাকাশে যাওয়াটা অসম্ভব”। এই বিজ্ঞ সম্পাদকের জোঁক-মুখে নুন ঢেলে মানুষ যখন চাঁদে যায়, তখন রবার্ট গডার্ডের কথাটার সত্যতাই হয় প্রমাণিত। ১৯৬৯ সালে চাঁদে পদার্পণের সময়ে তাই নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা বাধ্য হয় মাফ চাইতে প্রফেসর গডার্ডের আত্মার কাছে।

সবার শেষে বলি নামকরা কোম্পানি আইবিএম এর বড়কর্তা টমাস ওয়াটসনের কথা। ১৯৪৩ সালে যখন কিছু প্রকৌশলী কম্পিউটার নামের একটা যন্ত্র নিয়ে লাফালাফি করছে, তখন বিরক্ত হয়ে আইবিএম এর চেয়ারম্যান ওয়াটসন বলে বসেছিলেন, “সারাবিশ্বে মাত্র ৫টা কম্পিউটারের দরকার আছে”, কাজেই এই ব্যবসার কোন ভবিষ্যত নাই।

ওয়াটসনের কথাটা একেবারেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে, আজ সারা বিশ্বে মানুষের চাইতে কম্পিউটারের সংখ্যা বেশি, আর আইবিএম তাদের প্রায় সবটা আয়ই করে সেই কম্পিউটার থেকেই।

শেষ করি আরো একটা কথা দিয়ে, আমেরিকার প্যাটেন্ট অফিসের কমিশনার চার্লস ডুয়েল বলেছিলেন, ১৮৯৯ সালে, “নতুন আবিষ্কার??!! না বাপু, যা আবিষ্কার করা সম্ভব, তার সবগুলোই আবিষ্কার হয়ে গেছে। নতুন আবার কী আবিষ্কার করবে মানুষ?”

তাই অসামান্য অসাধারণ সেলিব্রেটি দের কথাকে বেদবাক্য হিসাবে মানা বাদ দিন, কারণ তারা নন, ভবিষ্যত গড়বেন আপনি, আমি, আম জনতা, সাধারণেরাই। কানে দিন তুলা, পিঠে বাঁধুন কুলা, আর সেই না-না-বলা সেলিব্রেটি বিশেষজ্ঞদের? ধরিয়ে দিন মূলা।

কথা নয়, কাজ

আমার জন্মস্থান চট্টগ্রামে ট্রেনে করে যাবার সময় শহরের ঠিক আগে আগে পড়তো ভাটিয়ারীর বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী আর ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ। সেখানে পাহাড়ের উপরে বড় বড় হরফে বেশ কিছু কথা লেখা ছিল, বহু দূরে, ট্রেন থেকেই দেখা যেতো, নানা আপ্তবাক্য, কর্মদক্ষতা বাড়াবার জন্য যেগুলো লাগবে কাজে।

এমনই একটা কথা ছিল–

"কথা নয়, কাজ"।

আরো সহজ বাংলায় আরেকটা কথা আছে, "হাতে থাকতে মুখে কী"

আমরা অনেক কাজ করার সময়ে আলোচনা, সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেই। কিন্তু আসল কাজটা আর শুরু হয় না। আলোচনা করে করেই সময় কেটে যায়। অনেক সময়ে সেটা হয় পারফেকশনের মোহে, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট কথাটা কি আর এমনি এমনি এসেছে?

কিন্তু বাস্তব কী বলে?

বাস্তব পৃথিবী এটাই বলে যে, অনেক সময় নিয়ে, অনেক দিন পার করে দিয়ে নিখুঁত কাজ করার চাইতে অধিকাংশ জায়গাতেই কাজটা শুরু করে দেয়াটাই বেশি দরকার।

বছর দুয়েক আগে শিক্ষক.কম শুরু করে দেয়ার বদলে আমি কিন্তু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জ্ঞানীগুণী বিশেষজ্ঞদের সাথে বিস্তর আলোচনা করতে পারতাম, ই-শিক্ষার তাত্ত্বিকতায় কাটাতে পারতাম বছরখানেক। তার বদলে এক রাতের চিন্তায় শুরু করে দিয়েছি, সেটা নিখুঁত হয়নি, অনেক কিছুই কাঁচা, কিন্তু শুরু তো হয়েছে, তাই না?

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মার্কেটে প্রথম যে যেতে পারে পণ্য বা সেবা নিয়ে, তার একটা আলাদা সুবিধা থাকে হাতে, হয়তো সেরা সে নয়, কিন্তু সবার আগে তো গেছে। কেবল ব্যবসা বা পড়াশোনা না, জীবনের

সব ক্ষেত্রেই দ্রুত শুরু করে দেয়াটা কিছু না করে বসে থেকে ভালোচনা করে বেড়াবার চাইতে অনেক অনেক ভালো।

আপনার পাড়ার রাস্তায় ময়লা জমে আছে? নিজে ময়লা জায়গা মতো ফেলুন। কোরিয়ার যে প্রকৌশলীর ছবি সব জায়গায় ছড়াচ্ছে, তার মতো করে ঝাড়ু দিয়ে অন্তত ১০ ফুট জায়গা হলেও সাফ করে দিন।

থিসিস লিখবেন? বা রিপোর্ট? পুরা কাজ করে শেষ করে তার পর বহুদিন ধরে লিখবেন সেই চিন্তা বাদ দেন, লিখে ফেলা শুরু করে দেন। শুরুতেই নিখুঁত হবে না, নিখুঁত হবার দরকারও নাই।

কোন সমস্যার সমাধানে 'কী করা উচিৎ', 'কী করতে হবে' এমন আলোচনায় আসল কাজটা কী আর হবে? বেশি বেশি কথা বলে, মিটিং টক শো করে ভালোচনা করে সময় নষ্ট করার সময় কোথায়, বরং "কথা নয়, কাজ" এই প্রবাদটাকে প্রিন্ট করে টেবিলের সামনে রাখুন টাঙিয়ে। পারফেকশনের অন্ধ মোহে সময় কাটালে দুনিয়া হবে গদ্যময়, কিন্তু আসল কাজটা হবে কচু আর ঘণ্টা।

কাজটা হবেই, ইতং বিতং কথা বলা বাদ দিয়ে শুরু করলেই...

তাই কথা নয় কাজ ... আসুন, নেমে পড়ি যার যার কাজে ... এখনই...

নিয়ম-বেনিয়ম

নিয়মের দরকারটা কী?

আপনি বাড়ির সামনে রাস্তার উপরে ডাস্টবিন থাকলেও সেখানে না ফেলে রাস্তায় ফেলবেন, কারণ নিয়ম আপনার ক্ষেত্রে খাটে না।

লাইনে সবাই দাঁড়ালেও আপনি দাঁড়াবেন না, কারণ আপনি স্পেশাল লোক। "সিস্টেম" খুঁজে ঢুকতে চান সবার আগে।

অথবা রাস্তায় উল্টা দিক দিয়ে গাড়ি চালাবেন, কারণ অন্য সবাই অপেক্ষা করুক বেকুবি করে, আপনি স্পেশাল, আপনার নিয়ম খাটে না।

আপনি রাজনৈতিক দলের নেতা, অথবা বড় ব্যবসায়ী, অথবা অভিনেত্রী, কিংবা খেলোয়াড়। তাই আপনি স্পেশাল, নিয়ম খাটে না কোনো। অথবা আপনি পদাধিকার বলে কোনো কিছুর নেতা, ব্যস, নিয়ম খাটে না।

কারণ? আপনি স্পেশাল।

নিয়ম? সে তো আম জনতার জন্য!!

নিয়মকে যদি বৃদ্ধাঙ্গুলি এভাবেই দেখানো হয়, তাহলে কি চলে? পৃথিবীর যেসব দেশ এগিয়ে গেছে সমৃদ্ধির শীর্ষে, তাদের সবার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল, নিয়মের প্রতি সম্মান। জাপান, জার্মানি, কিংবা আমেরিকা, সবখানে পুলিশ না থাকলেও লাল বাতিতে লোকজন দাড়িয়ে থাকে, কারণ ছোটবেলা থেকে নিয়ম মানার ব্যাপারটা শিখানো হয় বাচ্চাদের।

আর আমরা? আমরা বলি কী? অমুকে সুপারহিরো বলে তার জন্য নিয়ম খাটবে না, তমুকের ত্যাগের কারণে সে নিয়মের বাইরে, অথবা সমুকের দলবাজির কারণে সে স্পেশাল।

এই নিয়মহীনতাই কি আমাদের দেশটাকে পিছনে আটকে রাখছে না, বছরের পর বছর, প্রজন্মের পর প্রজন্মে?

তাই শুরুটা করুন নিজেই। নিয়ম ভাঙা না, বরং নিয়ম নিজে মানুন, অন্যদের মানতে শিখান। বিশেষ করে বাচ্চাদের। নিয়ম না মানতে মানতে অনেক প্রজন্ম হয়ে গেছে বেনিয়মী... অন্তত ভবিষ্যত প্রজন্মটা নিয়ম শিখুক, এগিয়ে নিক দেশকে...

ব্রান্ড কিংবা তকমা নয়, নজর দিন জ্ঞান দক্ষতায়

নানা সাইন্স ফিকশনে নতুন ধরণের সমাজের কথা পড়ি, যেখানে বিজ্ঞানীরা নীতিনির্ধারক, রাজনীতি হয়ে গেছে বৈজ্ঞানিক, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেরকম সাইন্স ফিকশনের জগতে আমরা কখনো পৌঁছবো কিনা তা জানি না, কিন্তু একটা জায়গায় আমরা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছি, তা হল জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতি।

জ্ঞানভিত্তিক সিস্টেমে ঐতিহ্য নয়, ভূগোল নয়, বরং জ্ঞানই শক্তি। যার জ্ঞান আছে, সেই ক্ষমতাবান।

ব্যক্তিগত পর্যায়েও জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্য গায়ে লেগে থাকা তকমা কিংবা বংশপরিচয়ের চাইতে বেশি, সম্প্রতি গুগলের হায়ারিং প্রসেসের পরিবর্তন সেটারই প্রমাণ দেয়।

গুগলে চাকরি পাওয়াটা ছিল এক সময় কেবল ‘‘অভিজাত’’, ‘‘নামকরা’’ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কপালে। আইভি লীগ, কিংবা এমআইটি, স্ট্যানফোর্ড, বার্কলের মতো বাঘা বাঘা জায়গার ডিগ্রি না থাকলে সে চাকরি পাওয়ার আশা ছিল কম। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেলো, হিসাব তো মিলছে না। নামকরা জায়গার ডিগ্রি থাকলেই সে ভালো প্রোগ্রামার হবে, অথবা ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসলেই কাজে কর্মেও সে দক্ষ হবে, তার কোন ই গ্যারান্টি নাই। গুগল তার কর্মীদের কাজের আউটপুট যাচাই করে যা দেখল তা হল, খুব বেশী ভালো ফলাফল করে আসা ‘‘ভালো ছাত্র’’ দের চাইতে বরং মাঝারি মানের ছাত্ররা ভালো কাজ দেখাচ্ছে। এর কারণটা খুব ইন্টারেস্টিং। যারা ছাত্রজীবনে সব সময়ে সফল হয়েছে, তারা ব্যর্থতা কাকে বলে তা বোঝে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে তো পদে পদে ব্যর্থতা আসবেই। এসব তথাকথিত ‘ভালো ছাত্র’ দের সমস্যা হল তারা সব সময় ভালো গ্রেড পেয়ে আসায় ব্যর্থতা থেকে শেখার অভ্যাসটা তাদের নাই। নিজের ভুলের কারণে একটা প্রোজেক্টে সমস্যা হতে পারে, সেটা তারা বিশ্বাস করতে পারে না সহজে, ফলে অন্যের

কারণে সমস্যা হয়েছে প্রোজেক্টে, সেই অজুহাত খুঁজে বেড়ায়। আর অন্যের মতকে সম্মান দেয়া, জুনিয়র কারো কাছ থেকেও কিছু শেখা যায়, সেই ব্যাপারটা মেনে নিতে এদের হয় কষ্ট।

ফলে গুগল এখন তার হায়ারিং প্রসেসে পরিবর্তন এনেছে। তারা এখন কর্মী নিয়োগের সময় কোন ইউনিভার্সিটির সিল ছাপ্পর লাগা কারো গায়ে, তার চাইতে বরং সেই কর্মীটি কী জানে, তাই দেখে বেশি। তার উপরে টিমওয়ার্কে, অন্যদের সাথে কাজ করতে, অন্যদের কথা ঠিক হলে তা মেনে নিতে কেউ কেমন সক্ষম, সেটাকেই গুগল এখন জিপিএ বা পরীক্ষার ফলাফলের চাইতে বেশি গুরুত্ব দেয়।

বাংলাদেশে এখনো আভিজাত্য, বংশপরিচয়ের জয়জয়কার। কে খানবাহাদূর বংশের, কে চৌধুরী সাহেব, আবার কে কোন কুলীন বিশ্ববিদ্যালয়ের, সেটাই পায় গুরুত্ব। কিন্তু জ্ঞান ভিত্তিক যে সমাজের দ্বারপ্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে, সেই সমাজে এসব কৌলীন্যের ভূমিকা কমই। বরং কার দক্ষতা কী, সেটাই তার পরিচয়। ব্রান্ডিং এর দিন চলেছে অস্তাচলে।

তাই নতুন প্রজন্মের তরুণ আর শিক্ষার্থীদের প্রতি অনুরোধ– ব্রান্ডিং নিয়ে মাথা ঘামানো বাদ দিন। আপনি কি জানেন, সেটাই আপনার শক্তি। কোন জায়গার থেকে এসেছেন, বাস্তব জীবনে, কর্ম ক্ষেত্রে সেটার ভূমিকা কমই হবে। দেশের ভিতরে, বাইরে পছন্দের জায়গায় ভর্তি হতে না পারলে জীবন শেষ, সেই ভাবনাটা তাই বাদ দিন। গুগল তা পেরেছে। বাকিরাও অচিরেই তা পারবে।

কারণ, জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই ভবিষ্যত।

মন ইঞ্জিনিয়ারিং

মন খারাপ? বিশাল কোন ধাক্কা খেয়েছেন? ডিপ্রেশনের অতলে তলিয়ে আছেন?

তাহলে এক লহমার জন্য থামুন, আর একটু ভাবুন।

কেন মন খারাপ, কিছু করার আছে কি?

আর্জেন্টিনা হারায় মন খারাপ হয়েছে? অথবা ব্রাজিল ৭ গোল খাওয়ায়? ঠিকাছে, কিছুক্ষণ কাঁদুন, কিন্তু আপনি যাই করেন না কেন, আনন্দিত কিংবা মন খারাপ, তাতে আপনার প্রিয় দলের খেলার ধরণটা পাল্টাবে না। অর্থাৎ যেসব বিষয়ে আপনার মন খারাপ হওয়া না হওয়ায় কিছুই যায় আসে না, সেখানে মন খারাপ করে বসে থাকলে ক্ষতিটা আপনারই।

কিছু না পেয়ে মন খারাপ? আপনি কি বেঁচে আছেন? যদি বেঁচে থাকেন, সুস্থ থাকেন, সেটাই বড় একটা মিরাকল। যা পাননি, তা না পেলে কি আপনি মারা যাচ্ছেন? খেয়াল করে দেখুন, অনেক প্রাপ্তি, অনেক অর্জনও কিন্তু মৃত্যুকে পারে না ঠেকাতে। স্টিভ জবস পারেননি। তার চাইতে আপনি তো অনেক বড় একটা জিনিস নিয়ে বসে আছেন এখনই– জীবন।

কিছু করতে না পেরে মন খারাপ? কাল করতে পারবেন? অথবা পরশু? অথবা অন্য কিছু করলে চলবে? যেটা করা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, সেটা আজ থেকে ১০ বছর পরে কি আপনার জীবনে খুব একটা ব্যাপার হবে? আজ কাল করা না করা নিয়ে মাথা ঘামালেও আজ থেকে ৫-১০ বছর পরে কি আদৌ মাথা ঘামাবেন?

কিছু হতে না পেরে মন খারাপ? কেন সেটা হতে হবে? কেন ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/আইনজীবী কিংবা সেলিব্রেটি হতে হবে? না হলে সমস্যা আছে কোন? সেটা না হয়ে অন্য কিছু হলে কি মারা পড়বেন?

পরের শ্রী দেখে মন খারাপ? ওর আছে, আমার নাই কেন? এইটাতে মন খারাপ? ছি আপনি এই লেভেলে নেমে যেতে প্রস্তুত আছেন? নিজের গায়ে পরশ্রীকাতর এর মতো কুৎসিত শব্দের ট্যাগ লাগাতে রাজি? নাহ, মনে হয় না। আগে নিজেকে প্রশ্ন করেন, বেল পাকলে কাকের কী, সেরকম পরের শ্রী দেখে তাতে আপনার কী?

এই তালিকা হতে পারত আরো দীর্ঘায়িত, কিন্তু তা না করে বরং মোদ্দা কথাটা বলি, মনকে চালানোর চাবিকাঠি আছে আপনার নিজের হাতেই। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা দিয়ে যেমন যন্ত্রপাতি মেরামত করে বেয়াড়া যন্ত্রকে আনা যায় বশে, তেমন বেয়াড়া বিষণ্ণতায় আক্রান্ত মনকেও ইঞ্জিনিয়ারিং করে করে ফেলুন ঠিক।

কারণ আপনার মনে কী থাকবে, সেটা আপনিই পারেন ঠিক করতে।

মনের উপরে নিজের অধিকারটা খাটান। আজকেই।

কল্পনার অবারিত প্রান্তর

আপনার শিশুটি কি পড়ার বই না পড়ে পড়ছে গল্পের বই? তাহলে তাকে কী করবেন? কষে একটা ধমক? গল্পের বইটা কেড়ে নিয়ে ঘাড় ধরে বই পড়িয়ে তোতাপাখি বানানো? এবং 'আউট বই' পড়ার দায়ে আর কোন শাস্তি?

বাংলাদেশের অভিভাবকদের পুরানো অভ্যাস এটা। আপনি মনে করে দেখতে পারেন, স্কুলে পড়ার সময়ে এক বার হলেও বাবা-মায়ের বকুনি খেয়েছেন কিনা গল্পের বই পড়ার জন্য।

কিন্তু এই গল্পের বইগুলো কি আপনার পড়ার বইয়ের চাইতে ক্ষতিকর?

গল্পের বই না পড়ে পাঠ্যবইয়ের তোতাপাখি হওয়াটাই শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো?

না। বরং অনেক ক্ষেত্রে এই আউট বই, গল্পের বইগুলোই শিক্ষার্থীদের মনের জানালাটাকে পারে খুলে দিতে।

আমরা মানুষ– আমরা কল্পনা করতে পারি, দেখতে পারি স্বপ্ন। কিন্তু সেই স্বপ্ন দেখতে হলে স্বপ্ন দেখা, কল্পনা করাটাও করতে হবে রপ্ত। তা করার উপায় হল গল্পের বই পড়া। পাঠ্যবই তো শিশুরা পড়বেই, কিন্তু আমাদের পাঠ্যবই যেভাবে লেখা হয়, তাতে তারা গণিতের বদলে শিখে দুধে পানি মিশানো, অদ্ভুত কোন তৈলাক্ত বাঁশ, আর বাংলা কবিতার ফুলের গন্ধে ঘুম না আসা কাজলা দিদির জন্য আবেগের বদলে কবিতার কয়েক লাইন মুখস্থ করে হয় তোতাপাখি।

স্বপ্নদেখা ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়তে হলে তাদের কল্পনার রাজ্য হতে হবে অবারিত। তাই শিশুদের গল্পের বই পড়তে দিন, শিশুতোষ কার্টুন দেখতে দিন, আজগুবি হলেও নানা কাহিনী, রূপকথা, এসব পড়ে কল্পনার রাজ্যে দিন হারাতে।

কারণ আমরা চাই না এক পাল রোবট কিংবা ভেড়ার দল। আমরা চাই ভবিষ্যত প্রজন্ম হিসাবে এক দল মানুষ। স্বপ্ন দেখা, কল্পনা করা, কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেয়া, মানুষ।

কানা মামা ও কাজের ছু-মন্তর

"Done is better than perfect" (নিখুঁতভাবে করার বদলে বরং শুরু করাটাই বেশি ভালো)

খুব বিখ্যাত একটি প্রতিষ্ঠানের মূল মন্ত্র এটাই। কোন সে প্রতিষ্ঠান, তা জানার আগে দেখা যাক এর মানেটা কী।

পার্ফেকশনিস্ট, অর্থাৎ কোন কিছু নিখুঁতভাবে করাকে ধন্য ধন্য করা হয়, কিন্তু বাস্তবের জীবনে পারফেকশনের চাইতে কাজ শুরু করে দেয়াটাই আরো বেশি লাগে কাজে।

ভেবে দেখুন, ১০০% নিখুঁতভাবে, আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ শুরু করতে পারবেন না, সেটা ভেবে কতগুলো কাজ থেকে পিছপা হয়েছেন?

কোন কাজ করতে গিয়ে সেই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কারো মতো দারুণ কাজ পারবেন না, সেটা ভেবে গুটিয়ে নিয়েছেন হাত?

আপনার বন্ধু ভোম্বলের মতো ক্রিকেটে ছক্কা পিটাতে পারবেন না ভেবে ছেড়েছেন খেলা? অথবা গলায় সুরটা সাবিনা ইয়াসমিনের মতো নয় বলে ছেড়েছেন গান?

এক লাফে গাছের আগায় তো যায় না উঠা। কাজেই ১০০% পারফেকশন না হলে কাজ শুরু না করার দ্বিধায় ভুগে লাভটা কোথায়?

শুরু করে দিন। শুরু করাটাই আসল। সবজান্তা হয়ে, সব বুঝে শুরু করবেন ভাবলে আসলে ভাবতেই থাকবেন, কাজটা আর হবে না শুরু। আর জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজটা ৮০% ঠিকভাবে করা, আর ১০০% নিখুঁতভাবে করার মাঝে পার্থক্যটা সামান্যই।

বাংলায় প্রবাদ আছে না, 'নেই মামার চাইতে কানা মামা ভালো'?

শুরুতে যে কোম্পানির কথা বলেছিলাম, আমাদের বাংলার কানা মামার প্রবাদকে দিব্যি নিজেদের মটো বা মূলমন্ত্র বানিয়েছে যারা, কোন সে কোম্পানি?

তার নাম– ফেইসবুক।

ফেইসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক যাকারবার্গের এতো প্রিয় এই কথাটা যে, ফেইসবুকের অফিসের দেয়ালে লেখা আছে এই মন্ত্রটা।

আর দেরি না, শুরু করে দিন জীবনে ফেইসবুকের এই কাজের ছু-মন্তর। কাল নয়, পরশু নয়, আজকেই, এই মুহূর্তেই ...

Just Do it!!

ভয় জয় ফরমুলা: থাকুন নিশ্চিন্ত, নার্ভাস নাইন্টিজে

ভয় লাগছে?
বুক দুরুদুরু করছে?
হতে পারে কাল খুব বড় একটা পরীক্ষা।

অথবা ব্যবসার কোন বড় ডিল নিয়ে ভাবছেন। বা, দিচ্ছেন চাকরির ইন্টারভিউ।

কিংবা ক্রিকেটার, ৯৯ রান নিয়ে সেঞ্চুরির মুখে নার্ভাস নাইন্টিজে কাঁপাচ্ছেন হাত।

অথবা আরো অন্য কিছু, দোকানে কাল দেখে আসা পাখি জামাটা আজকে গেলে পাবেন কিনা, তাই ভাবছেন।

এরকম অবস্থায় আপনি আমি সবাই পড়েছি, কোন না কোন সময়ে। মানসিক চাপ, টেনশন, এসবের কারণে হয়তো বাড়াচ্ছেন ব্লাড প্রেশার, মাথার চুল যাচ্ছে সব পড়ে। কিংবা ঘুম আসে না, তাই না?

এক ধাপ পেছনে যান। চোখ বন্ধ করুন। বুক ভরে নিঃশ্বাসটা নিন।

আর ভাবুন।

What's the worst thing that can happen?

যা চাচ্ছেন, তা যদি না পান, তাহলে কী জীবন বৃথা?

গোল্ডেন জিপিএ হয় তো পাবেন না, তাতে কি মারা পড়বেন? পছন্দের ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ না পেলে দম যাবে বন্ধ হয়ে?

যে জিনিসটা নিয়ে এতো চিন্তা করছেন, তা না পেলে কি আপনি বেঁচে থাকবেন না? একটা সুযোগ বন্ধ হলে মিলবে না আর কোন সুযোগ? খুলবে না আর কোন দরজা?

অবশ্যই। আজ বা কাল যদি আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটা নাও পান, সুযোগটা নাও মিলে, তাহলেও কিন্তু আপনি সফলভাবে অন্তত একটা

কাজ করতে পারবেন, বেঁচে থাকা, আরেকটি দিনের, আরেকটি সূর্যোদয় দেখার সুযোগ পাওয়া।

৯৯ রানেই নাহয় আউট হলেন, অথবা অমুক ইউনিভার্সিটির বদলে তমুকটায় হলেন ভর্তি। দুই দিন, তিন মাস, অথবা বছর চারেক পরে আর কি সেটা নিয়ে কেউ ভাববে? হবে কোন উনিশ বিশ?

ভয়কে তাই করুন জয়। না পেলে নাহয় না-ই পেলেন। কিছু কি যায় আসে? আজ আসলেও কাল কি আর আসবে?

চোখ বন্ধ করুন, প্রশ্নটা করুন নিজেকে।

আর জয় করুন সবচেয়ে বড় বাধা,

ভয়কে।

পয়েন্ট এ টু পয়েন্ট বি– স্বপ্নের মানচিত্র

আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি। বড় হয়ে এটা হবো, সেটা হবো, আরো কত্তো কী! কিংবা পড়াশোনা, খেলা, অথবা পেশার ক্ষেত্রে, বা ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের অনেক কিছুই আরাধ্য, অনেক কিছুই হতে পারা কিংবা হাতে পাওয়াটা স্বপ্ন।

তাহলে সেই স্বপ্নগুলো বাস্তবে পরিণত হয় না কেন?

এক লাফে যেমন গাছের উপরে ওঠা যায় না, তেমন আলাদীনের চেরাগ না হাতে থাকলে রাতারাতি সাকিব আল হাসান কিংবা মেসি হওয়া যায় না, অথবা পারা যায় না হতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা স্বপ্নের মতো নায়ক।

তাহলে স্বপ্নকে বাস্তবে পূরণ করতে লাগবেটা কী?

একটা খাতা। সাদা খাতা। আর একটা কলম।

যেটাতে আপনি গড়বেন আপনার স্বপ্নপূরণের ম্যাপ।

স্বপ্নের মানচিত্রটা খুব সোজা। পয়েন্ট এ হল আপনার এখনকার অবস্থা। আর পয়েন্ট বি হল আপনি যেখানে যেতে চান, যা হতে চান, যা পেতে চান।

পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি তে যেতে হলে আপনাকে কয়েকটা ধাপ পেরোতে হবে। দিবাস্বপ্ন দেখে সময়টা নষ্ট না করে তাই মাঝের ধাপগুলো কই, তা বের করে নিন। বড় হয়ে ডাক্তার হতে চান? ভর্তি পরীক্ষা পেরোতে হবে, তার আগে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করতে হবে। প্রকৌশলী? অংকের ভিতটা গড়তে হবে সবার আগে। হতে চান ভালো ক্রিকেটার? নিয়মিত করতে হবে অনুশীলন। অথবা পেতে চান নামকরা কোথাও চাকরি? কিভাবে সেটা পেতে হবে, ধাপ ধাপ লিখে নিন আপনার স্বপ্নের মানচিত্রে।

তার পর আর দেরি নয়, পড়ুন ঝাঁপিয়ে। এক লাফে গন্তব্যে তো পৌছাতে পারবেন না। কিন্তু আজকে, কালকে, কিংবা পরশু প্রথম ধাপটা তো পারবেন পেরোতে, তাই না?

স্বপ্নের মানচিত্রটা তাই শুরু করে দিন, সাদা কাগজে শুরু করুন আপনার পথযাত্রা।

কী আছে, আপনার কাছে?

সিনেমার সেই ডায়ালগটা মনে আছে তো? অহংকারী ভিলেন এসে নীতিবান নায়ককে ব্যঙ্গ করছে, বলছে, আমার কাছে বাড়ি, গাড়ি, সবই আছে, তোর কাছে আছেটা কী? নায়ক একটু চিন্তা করে বলল, আমার কাছে আছে মা! হাততালি...

এটা সিনেমার ডায়ালগ, কিন্তু ফিরে আসুন বাস্তবে এবার। স্বীকার করুন বা না করুন, আমাদের সবার কাছে সবকিছু নাই। আপনার বন্ধুর আইফোন ৬ আছে, আপনার নাই, আপনার বন্ধু দামি ব্রান্ডের শার্ট পরে, আপনি পরেন না। অথবা আপনার বন্ধু পরীক্ষায় গোল্ডেন পেয়েছে, আপনি পাননি। কেউ অমুক দোকানে পার্টি দিয়ে নাম কিনে, আপনি পারেন না। এলিট, কুলীন ইউনিভার্সিটিতে অমুকে পড়ে, আপনি চান্স পাননি সেখানে।

এসব নিয়ে কি মন খারাপ করে বসে থাকেন? সবার হৈ হুল্লোড় দেখে, অথবা ফোন, শার্ট, বা গোল্ডেন পাওয়া বন্ধুর জয়জয়কার দেখে, বাগাড়ম্বর দেখে কুঁকড়ে যান?

নিজের না থাকার, না পাওয়ার হিসাব করেন?

হিসাবটাই পাল্টে দিন। আজকেই। আপনার কাছে কী নাই তার হিসাব নিকাশ করার বদলে বরং উল্টোটা করুন, আপনার কাছে কী আছে, তাই ভাবুন। না থাকুক আপনার চকচকে কিছু একটা, অথবা না থাকুক পিঠ চাপড়াবার, তারিফ করার সাঙ্গপাঙ্গ, কিন্তু আপনার কাছে তো অনেক কিছুই আছে, তাই না? দরকার হলে খাতা কলম নিয়ে বসেই হিসাবটা করে ফেলুন, আপনার কাছে কী আছে?

বাজি ধরে বলতে পারি, অবাকটা আপনিই হবেন। কারণ– না পাবার, না থাকার হিসাবের যায়গায় যখনই করতে বসবেন কী আছে তার হিসাব, দেখবেন, আপনার ধারণার বাইরে অনেক কিছুই আছে আপনার কাছে।

তার জন্য শুকরিয়া করুন, নিজেকে ভাবুন ভাগ্যবান।

কারণ আপনার দাম্ভিক বন্ধু যাই বলুক না কেন, আপনার কাছে অনেক অনেক কিছুই আছে। আর এই ভাবনার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় সম্পদটাকেও ধরে ফেলুন, নিজের মনে স্থান দিন।

সেটা হল স্বপ্ন।

আনন্দময়, উজ্জ্বল, মন ভালো করা স্বপ্ন।

শুরুটা করে দিন, আজকেই ...

স্বপ্ন দেখার অনুশীলন

স্বপ্নের চেয়ে বড় মন ভালো করার উপায় আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু দেয়ালে যখন পিঠ ঠেকে যায়, তখন স্বপ্ন দেখবেন কিভাবে?

আছে, উপায় আছে। মন প্রকৌশলের অংশ হিসাবে, মন ভালো করার কৌশল হিসাবে খুব গুছিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করুন। তবে তা ঘুমের মাঝের স্বপ্ন না, বরং জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা।

স্বপ্ন দেখার প্রোজেক্ট হিসাবে শুরুতেই কাগজে কলম নিয়ে বসে পড়ুন। অবশ্যই কাগজ কলম নিয়ে বসতে হবে, কম্পিউটার/কীবোর্ড নিয়ে বসলে চলবে না। অথবা সব মাথার ভিতরে রেখে স্বপ্ন দেখতে বসলে চলবে না, কারণ মনের মাঝে পরিকল্পনা রেখে দেয়া আর পানির উপরে লেখা, একই কথা।

কাগজ কলমে লেখার আরেকটা দরকারি দিক হল, আপনার মন থেকে হাতের কলম পর্যন্ত পৌছাতে পৌছাতে ভাবনাটা, স্বপ্নটা আরো অনেক গোছানো হবে।

প্রথম কাজ– আপনি কী হতে চান, পেতে চান, তা লিখে ফেলুন। স্বল্প মেয়াদে না, আমি বলছি দীর্ঘ মেয়াদে, আজ থেকে ৫ বছর পরে, সেই সময়ের কথা। একটা দুইটার বদলে আপনি দরকার হলে দশটা জিনিস লিখেন, যা আপনি পেতে চান, যা আপনি হতে চান। হতে পারে, আপনি

দ্বিতীয় কাজ– এই তালিকার কোন জিনিসটা পেতে বা কী হতে আপনি সবচেয়ে বেশি আসলেই চান? এবং সেটা পেলে বা সেটা হতে পারলে আপনার কী লাভ হবে? প্রতিটি জিনিষের ক্ষেত্রে এটা লিখে ফেলুন। এটা লেখাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনি আসলেই এইগুলো চান কি না, পেলে আপনার জীবন কি পাল্টাবে, সেটা ভাবতে হবে।

তৃতীয় কাজ– এবারে তালিকাটার দিকে তাকান, ভালো করে ভাবেন। কোনটা সবচেয়ে আরাধ্য ও জীবন পাল্টে দেয়া জিনিস ? আপনি কোনটা

পেলে সবচেয়ে বেশি সুখী হবেন? এইখানে কিন্তু আপনার নিজের সুখের কথা ভাবতে হবে। অন্য কাউকে খুশি করা না, স্বার্থপর শোনালেও নিজে কোনটা পেলে বা হলে সুখী হবেন, সেটার ভিত্তিতে তালিকার এন্ট্রিগুলোর ক্রম নির্ধারণ করে ফেলেন।

এবং চতুর্থ কাজ– এটা খুব সহজ। তালিকার প্রথম কয়েকটা স্বপ্ন, আরাধ্য কিছু, সেগুলোকে বেছে নিন। চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন, আপনি সেটা পেলে কতটা সুখী হবেন। এবারে চোখটা খুলে কাগজ কলম নিয়ে আরেকবার বসে যান, এই স্বপ্নগুলোকে পেতে হলে আপনাকে কী করতে হবে। তারপর? শুরু করে দিন স্বপ্নের পথে এগিয়ে যাওয়া।

স্বপ্নের কাছে পৌঁছানো যদি বহু দীর্ঘ একটা যাত্রা হয়, তবে আজকে শুরু করে দিন প্রথম পদক্ষেপ।

আর স্বপ্ন দেখার এই প্রোজেক্টের শেষ কথাটা বলি, স্বপ্ন দেখবেন অনেক বড়, অনেক লম্বা লম্বা। স্বপ্ন দেখার প্রোজেক্টে লেগে থাকলে যদি সেই বড় স্বপ্নের সূর্যের কাছে নাও পারেন পৌঁছাতে, তবুতো তার কাছাকাছি, হয়তোবা স্বপ্নের চাঁদের কাছে যেতে পারবেন এক সময়ে।

স্বপ্ন দেখার প্রোজেক্ট– শুরু হোক আজ থেকেই। নাহ, ভুল বললাম, এক্ষুনি শুরু হোক, শুরু করে দেন।

অনুপ্রেরণা: অন্ধকারে আমাদের আলোর দিশা

আপনার কি দেয়ালে ঠেকে গেছে পিঠ? পড়াশোনা অথবা কাজে কর্মে, ক্যারিয়ার নিয়ে হতাশ? ভয় লাগছে, অথবা কী করবেন পাচ্ছেন না কোন দিশা?

আপনার কেবল দুইটা জিনিস দরকার এই মুহূর্তে। সেটা প্যারাসিটামল না, কোন ধন্বন্তরি ওষুধ না। সে দুইটা জিনিস হল– অনুপ্রেরণা আর স্বপ্ন।

আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ আর শক্তি হল আমাদের মন। কাজে কর্মে, সাফল্য আসতে হলে এই মনকে দখলে আনতে হবে। মন হল আপনার সবচেয়ে বড় বন্ধু, আবার সবচেয়ে বড় শত্রুও হতে পারে মনটাই। সফল হতে হলে, সুখী হতে হলে সবচেয়ে বেশি দরকার আপনার মনটাকে দখলে আনা।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় কখন? যখন আপনার মনের শক্তিটা যায় হারিয়ে, কোন পথে যাবেন, তা বুঝতে পারেন না। এই দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার ক্ষণে আপনার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে লাগবে অনুপ্রেরণা, লাগবে স্বপ্ন দেখার সাহস আর ক্ষমতা।

অনুপ্রেরণা পেতে হলে কী করতে হবে? আসুন, দেখা যাক কয়েকটা কায়দা–

মন খারাপ, স্থবির কেন? আপনার মনে কি ভয় ঢুকেছে? কেন ঢুকেছে? না পারার ভয়? তাহলে সবার আগে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিন। পেরেছেন? তার মানে আপনি বেঁচে আছেন? এটা যদি পারেন, তাহলে আপনি বিশ্বজয়ের মতো বড় কাজ না করলেও কাছাকাছি একটা বড় কাজ করেছেন– আপনি জীবন এখনো আছে, সেটা পৃথিবীতে এই ক্ষণিকের অবস্থানে একটা বড় সাফল্য, বড় অর্জন। সেটা যখন আছে, আর কিছুকে ভয় করার কি কিছু আর আছে?

আপনার অবস্থায় কি কেউ আগে কখনো পড়েনি? অবশ্যই পড়েছে। মানবজাতির ইতিহাসে আপনার অবস্থায় থাকা আপনি প্রথম ব্যক্তি নন, তাই না? এবং আপনার এই অবস্থায় পড়া অন্যান্যরা সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছেন নানা সময়ে, সেটাও তো মানেন, অথবা জানেন, তাই না? মানলে ও জানলেই চলবে না, বিশ্বাস করতে হবে। পুরোপুরি।

অনুপ্রেরণায় বিশ্বাস করুন। আর সব কিছুকে না বলুন। মনটা আমাদের পানির মতো, যেভাবে চালাবেন সেভাবেই চলবে। মনকে যদি গড়াতে দেন হতাশার অন্ধকারে, তাহলে মনটা সেখানেই যাবে। জলদি থামান মনকে, গড়িয়ে গর্তে পড়ার আগেই মনটাকে জোর করে ভালো রাখুন।

মনের মালিক আপনিই– মন কোনদিকে যাবে, তার নিয়ন্ত্রণ আপনার কাছেই। অনুপ্রেরণার নাগপাশে বেঁধে ফেলুন মনকে, আর দরকার হলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যান আশার আলোর দিকে।

ঘুরে দাঁড়ানো, জীবন বদলে দেয়া মানুষদের গল্প

ভাগ্যের চাকা, দেয়ালে ঠেকা পিঠ বনাম একাদশে বৃহস্পতি

জীবনে শেষ বলে কি কিছু আছে? আপনার পিঠ আজ দেয়ালে গেছে ঠেকে, তার মানে কি আগামীকালেও সেটা হবে?
আসুন, একজনার গল্প শুনি।

চীনের সেই গণিতের ছাত্রটির জীবন সরলরেখায় চলেনি। চীনের ভয়াবহ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পাল্লায় পড়ে তার কৈশোর আর তারুণ্যের শুরুটা কেটেছিল পড়াশোনার বাইরে। অনেক পরে পড়াশোনায় ফেরত এসে মেধাবী ছাত্রটি প্রথমে আন্ডারগ্রাজুয়েট ডিগ্রি পেলেন গণিতে, অনেক আশা নিয়ে পড়তে গেলেন আমেরিকায়। ৯১ সালে আমেরিকার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা– পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে পিএইচডি ডিগ্রিও পেলেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর পরের কাহিনীটা হয় অনেক কিছু পাবার, বড় চাকরি গাড়ি বাড়ির। কিন্তু এই ছাত্রটির জীবনে তা হয়নি, দুর্ভাগ্য ছাড়েনি তার পিছু।

গণিত অন্তপ্রাণ এই দুর্ভাগা ছাত্রটি কিছুতেই চাকরি খুঁজে পাননি। এক পর্যায়ে লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে তিনি নামলেন খাবার পৌঁছে দেয়ার কাছে, চীনা রেস্টুরেন্টের ডেলিভারি ম্যান হিসাবে কাজ করলেন অল্প বেতনে। তার পরে সাবওয়ে ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টের একেবারে নিম্নবেতনের চাকরিও করতে হল, যেটা একজন ডক্টরেট ডিগ্রিধারীর জন্য অভাবনীয়। কিন্তু কী করবে, দুর্ভাগ্য তো তাঁর পিছু ছাড়ে না।

এভাবে কেটে গেলো ৮টি বছর।

অনেক কষ্টে ৪৪ বছর বয়সে ১৯৯৯ সালে এক অখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের লেকচারার পদে চাকরি পেলেন। নাহ, অধ্যাপক হিসাবে না, তাকে নেয়া হল আরেকটি নিচের পদে, আর সেখানেই প্রমোশন ছাড়া ১৪টি বছর কাটিয়ে দিলেন এই গণিতজ্ঞ। ২০০১ সালের পর ১২ বছর ধরে কোন গবেষণাপত্রও প্রকাশ করতে পারলেন না।

তার পর?

এলো ২০১৩ সাল। বয়স তখন তার ৫৮। একাকী নিভৃতে কাজ করা এই গণিতজ্ঞ হঠাৎ করে গণিতের দুনিয়াকে অবাক করে দিলেন একটি গবেষণা পত্র লিখে। কয়েকশ বছর ধরে মৌলিক সংখ্যার একটা সমস্যা– টুইন প্রাইম কনজেকচার– কেউ সমাধান করতে পারেননি, এই নিভৃতচারী গণিতজ্ঞ একটা পেপার লিখে সেই সমস্যার সমাধানের একটা বিশাল ধাপ এগিয়ে গেলেন। খুব দ্রুত সেই পেপারটা বিজ্ঞ গণিতজ্ঞদের হাতে যাচাই হয়ে প্রকাশিত হল।

ভাগ্যের সোনার হরিণ অবশেষে ধরা দিল সেই দুর্ভাগা গণিতজ্ঞ– ইতাং ঝাং (Yitang Zhang) এর কপালে। ২০১৩ সালেই পেলেন গণিতের খুবই বাঘা বাঘা সব পুরস্কার– অস্ট্রোওস্কি প্রাইজ, ২০১৪তেও লাগাতার আসতে লাগলো এমন সব পুরস্কার।

লেকচারার পদ থেকে এক লাভে ২টি ধাপ পেরিয়ে তাকে করা হল প্রফেসর।

আর গতকাল? ইতাং ঝাং পেলেন বিশ্ববিখ্যাত ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশনের ফেলোশিপ, যাকে বলা হয় জিনিয়াসদের জন্য বিশাল একটা পুরস্কার, যার মূল্যমান ৬২৫, ০০০ ডলার! কেবল প্রচণ্ড প্রতিভাবানদের কাজের স্বীকৃতি হিসাবেই এটা দেয়া হয়।

তো ইতাং ঝাং এর ভাগ্যটা গেছে খুলে, কিন্তু তার গল্প থেকে আপনার কী শেখার আছে?

এটাই, যে জীবনের, ভাগ্যের বিশাল পরিবর্তনের সময়টা কখনো হয় না শেষ। আপনার পিঠ ঠেকতে পারে দেয়ালে, কিন্তু পরিবর্তন আসে, আসবেই। চেষ্টা করুন, ৮ বছর ধরে অড জব করে কাটানো ইতাং ঝাং যদি নিজের চেষ্টায় পারেন ভাগ্যকে ফেরাতে, তাহলে আপনি কেন পারবেন না?

অবশ্যই পারবেন।

কারণ ভাগ্যটা আপনি নিজেই গড়বেন।

বয়স কোন ব্যাপার না, আপনার ভাগ্যটা পাল্টাবার সময় কখনোই যায় না চলে।

ভাগ্যটা গড়বেন আপনিই, আর কবে গড়বেন, সেটাও নির্ধারণ করবেন,

আপনিই।

পুনর্জন্ম

বিকালের অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলো, একটি কিশোর তার মায়াবী প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, Nothing gonna change my love for you...

মনে পড়ছে গানটা? কিন্তু এর সাথে জীবনের, কাজের, পেশার পুনর্জন্মের সম্পর্কটা কোথায়?

চলুন দেখা যাক...

ভালো লাগার কাজটি কি খুঁজে পেয়েছেন? হয়তো পেয়েছেন, হয়তো পাননি। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই হয়তো আপনার ক্যারিয়ারের, পেশার কাজটা আসলে আপনার স্বপ্নের কাজ না। পেটের দায়ে কাজ করেন, কিন্তু মন পড়ে আছে হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথাও।

তো, আপনি কী করবেন তাহলে? করেই যাবেন অপছন্দের কাজ সারাটা জীবন? পরিবর্তনকে করবেন ভয়? নাকি সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে নিবেন পুনর্জন্ম– পছন্দের কাজটাকেই বেছে নিবেন কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করে হলেও?

প্রশ্নটার জবাব আপনি ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না, তাই সেই দুঃসাহস দেখাচ্ছি না, কিন্তু তার বদলে একটা গল্প বলি।

লেখার শিরোনামের ইংরেজি বাক্যটা দেখেছেন তো? চেনা চেনা লাগে? ক্লাসিক সব মিউজিক ভিডিও যদি দেখে থাকেন, তাহলে এইটা মনে পড়ার কথা। সেই যে, সমুদ্র সৈকতে ব্যাকুল এক কিশোর তার প্রেয়সীর জন্য গান গাইছে চরম ভালোবাসায়, সুন্দরী সেই মেয়েটার সাথে কাটাচ্ছে প্রেমময় সোনালী সব মুহূর্ত।

গানটা অনেক পুরানো হলেও ১৯৮৭ সালে এই মিউজিক ভিডিওতে এই গানটার কভার করে রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান গ্লেন মেডেইরোস (Glenn Medeiros)। হাওয়াই এর এই গায়কের বয়স তখন মাত্র ১৭। এই কিশোরের প্রথম গানটাই কিন্তু নানা চার্টের শীর্ষে উঠে

যায়, ১ নম্বরে পৌছায় ব্রিটেনের চার্টে। হঠাৎ সুপারস্টার বনে যাওয়া গ্লেনের কিন্তু এটাই একমাত্র হিট না, তার ৩ বছর পরেই আরেকটি #১ হিট গান গেয়ে তাক লাগিয়ে দেন সবাইকে। তবে আর যাই হোক, আপনারা অনেকেই অন্তত তার সেই অরিজিনাল গানটা (নাথিং গনা চেইঞ্জ মাই লাভ ফর ইউ) দেখেছেন, অন্তত একবার।

কিন্তু এর পরে কী হল? নব্বই এর দশক এর শুরু হতে কোথায় গায়েব হয়ে গেলেন গ্লেন? খেয়াল করে দেখুন, তার কিন্তু আর কোন গান, আর কোন অ্যালবামের খবর নাই।

ক'দিন আগে হঠাত এই প্রশ্নটা জাগল ইউটিউবে গানটা দেখতে গিয়ে। খোঁজ করতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। সেই প্রেমিক কিশোর গ্লেন মেডেইরোস আজ ড. গ্লেন মেডেইরোস, এবং তিনি এখন হাওয়াই এর একটি হাইস্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল।

ব্যাপারটা কিন্তু এমন না যে গানের জগতে ফ্লপ মেরে গ্লেন মাস্টারিতে মন দিয়েছেন। বরং খ্যাতির চরম শিখরে থাকার সময়ে গ্লেন এর মনে হয়, তাঁর পছন্দের কাজ এটা নয়, বরং শিক্ষকতার মাধ্যমে জ্ঞানের আলো ছড়ানোই তাঁর জীবনের লক্ষ্য। ব্যাস, সুপারস্টারগিরি ছেড়ে দিয়ে রাতারাতি স্কুল শিক্ষক হিসাবে কাজ শুরু করেন। আর পড়াশোনাও করতে থাকেন, ইউনিভার্সিটিতে ব্যাচেলরস, মাস্টার্স এসব করতে করতে গত বছর পিএইচডি ডিগ্রিও লাভ করেন শিক্ষার উপরে।

গ্লেন এর এই পুনর্জন্মকে কী বলবেন? বোকামি? সুপারস্টার হতে স্কুল টিচার– এ কী তাঁর পতন? মোটেও না। বরং গ্লেন সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে পেরেছিলেন, পেটের দায়ে, টাকার লোভে অপছন্দের কাজ করতে জীবন পার না করে নিজের পছন্দের কাজটি বেছে নিতে পেরেছেন।

এর জন্য সাহস লাগে, লাগে স্বপ্ন দেখার জোর ক্ষমতা।

আপনার কি সেটা আছে?

গ্লেনের থাকলে, আপনার থাকবে না কেন?

প্রশ্নটা নিজেকে করুন, আর বেছে নিন নিজের পছন্দের কাজ।

জীবন তো একটাই ... বার বার সুযোগ পাবেন না। রেলগাড়িরা স্টেশনে বসে থাকবে না বার বার, চলে যাবার আগেই তাই পছন্দের ট্রেনে চড়ুন, বেছে নিন পছন্দের কাজটা।

আজই।

দশরথের তাজমহল কিংবা শাহজাহানের রাস্তা

একজন মানুষের পক্ষে কি পর্বতসম পরিবর্তন আনা সম্ভব এই পৃথিবীতে?

অবশ্যই। আর এর বড় প্রমাণ হলেন দশরথ মানঝি। নিজের গ্রামের মানুষের অশেষ দুর্ভোগের নিরসন করতে খালি হাতে একাই যিনি একটি পর্বত খুঁড়ে তৈরি করেছিলেন রাস্তা।

দশরথের জন্ম বিহারের গয়া শহরের কাছের এক গ্রামে। পেশায় দিনমজুর। "কাছে" বললে ভুল করা হবে, ম্যাপে কাছে মনে হলেও তাঁর গ্রাম আর গয়া শহরের মাঝে এক বিশাল পর্বতের অবস্থান। আকাশদূরত্ব খুব অল্প হলেও পুরা পর্বতটাকে ঘুরে যেতে হয়, ফলে ১৫ কিলোমিটারের বদলে ৭০ কিলোমিটার পথ পেরোতে হয়।

১৯৬০ সালে দশরথের স্ত্রী ফাল্গুনী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে নিয়ে গয়া শহরে রওনা হন দশরথ, কিন্তু ৭০ কি.মি. পথ পেরিয়ে যেতে গিয়ে ফাল্গুনী বিনা চিকিৎসায় এক সময় মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েন দশরথ, তাঁর মনে হয়, কেবল তিনি নন, গ্রামের অসংখ্য মানুষ এই অল্প কয়েক কিলোমিটার পর্বতের বাধার কারণেই ৭০ কি.মি. পথ কয়েক ঘণ্টায় পার হতে বাধ্য হচ্ছে, আর ফাল্গুনীর মতো অনেকে যাচ্ছে হারিয়ে।

সরকারী বা অন্য কারো সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে দশরথ নিজেই পড়লেন নেমে, হাতে কেবল হাতুড়ি আর বাটালি। পর্বতের পাথর একাই এবং কোন ভারী যন্ত্রপাতি ছাড়া ভেঙে গড়তে শুরু করলেন রাস্তা। লোকে হাসল, আর বলল, একজন মানুষের পক্ষে এটা করা অসম্ভব!

কারো কথায় শুনে হাল ছেড়ে দিলে কি ভালো কাজ হয়? দশরথ কাজ করে চললেন, একাই, হাতুড়ি বাটালি দিয়ে। দীর্ঘ ২২ বছর কাজ করার পরে অবশেষে অসম্ভব হল সম্ভব, পাহাড়ের পাথর কেটে ৩৬০ ফুট দীর্ঘ

আর ৩০ ফুট চওড়া একটা পথ তৈরি করতে পারলেন। ৭০ কিলোমিটারের রাস্তা কমে দাড়ালো মাত্র ১৫ কিলোমিটার, দশরথের গ্রামের লোকদের আর অপেক্ষা করতে হল না অনেক সময় শহরে পৌছাতে। পাল্টে গেলো সে গ্রামের মানুষের জীবনধারা।

দশরথ এই রাস্তা বানানোর জন্য কারো কাছ থেকে ১ পয়সাও পাননি। সরকারের দপ্তরে দপ্তরে বহুবার গিয়েছেন রাস্তা বানানোর জন্য, কিন্তু তারা যখন সাহায্য করেনি, দশরথ নিজেই এগিয়ে এসেছেন। অসম্ভবকে করেছেন সম্ভব।

সম্রাট শাহজাহান ২২ বছর ধরে ২০ হাজার শ্রমিক খাটিয়ে জনগণের পয়সায় বানিয়েছেন তাজমহল, আর দশরথ কাজ করেছেন একাকী, জনগণের স্বার্থে পর্বত চূর্ণ করে বানিয়েছেন এই রাস্তা। শখের তাজমহলের চাইতে আমার কাছে তাই দরকারের এই রাস্তাটিই সপ্তাশ্চর্যে যুক্ত হবার মতো অসাধারণ একটা কাজ, আর এই অসাধারণ মানুষটি পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

সমাজের, দুনিয়ার পরিবর্তন আনতে তাই অন্যদের সাহায্যের অপেক্ষায় বসে থাকার দরকার নাই, আসুন নিজেরাই এগিয়ে আসি, নিজেদের সমস্যার সমাধানে।
মানুষ, মানুষের জন্য...

বিস্তারিত জানতে–

http://www.indianexpress.com/news/the-man-who-made-way-for-progress/968751/0

http://en.wikipedia.org/wiki/Dashrath_Manjhi

আঁধারের আলো: আপনি কি পাচ্ছেন দেখতে?

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়ে যদি মনে হয় পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, তাহলে পড়তে থাকুন। না হলেও পড়ুন, কারণ কোন এক সময় হয়তোবা আপনার পিঠ ঠেকে যাবে...

ভাবুন তো, যদি এমন হতো, আপনার নিজের দেহেই আপনি হয়ে পড়লেন বন্দী; দুনিয়ার সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন, কিন্তু কিচ্ছু বলতে পারছেন না, মুখে কিংবা আকারে ইঙ্গিতে। সবাই আপনাকে ধরে নিয়েছে জড়বস্তু, ভাবনা-চিন্তা-শক্তিহীন জড়বস্তু।

কী ভয়াবহ, তাই না? কিন্তু ঠিক এমনটাই ঘটেছিল এক কিশোর মার্টিন পিস্টোরিয়াস এর জীবনে। মাত্র ১২ বছর বয়সে হঠাৎ করে অদ্ভুত এক অসুখে আক্রান্ত হলেন তিনি, অচেতন হয়ে কোমায় চলে গেলেন। ডাক্তারেরা রায় দিল, মার্টিন চলে গেছেন ভেজিটেটিভ অবস্থায়, মানে তার মন মস্তিষ্ক কাজ করছে না, কেবল দেহটা কাজ করছে। আসলেও তাই হয়েছিল। ব্যাপারটা এখানেই থামতে পারত। কিন্তু না।

দুই বছর কেটে যাবার পরে মার্টিনের জ্ঞান ফিরল, কিন্তু দেহটা ফিরলো না। মানে চোখ মেলতে পারলেও দেহের কিছুই নড়াতে পারতেন না। আর সবাই তাকে তখনো ধরে নিল কোমাতেই থাকা, তার যে জ্ঞান ফিরেছে ভিতরে ভিতরে, তা কেউ বুঝতে পারেনি।

সীমাহীন একাকীত্ব আর দুঃসহ মানসিক কষ্টে মার্টিনের কেটে গেলো বছরের পর বছর। এমনকি খুব কাছের মানুষেরাও তাকে আসবাবপত্রের মতো দেখছে, মানুষ হিসাবে দেখছে না, তার কোন কথা শুনতে বুঝতে পারছে না, এর মতো ভয়াবহ কারাগার কি আর কোথাও হতে পারে?

এভাবেই কাটলো অনেকদিন।

১২ বছর!!

তার পরেও মার্টিন আশা ছাড়েননি। মানে একবার আশা ছেড়ে নিজের মনটাকে বন্ধ করে দিলেও এক সময়ে আবার মনের শক্তিতে দেখতে থাকেন আশার আলো।

অবশেষে ২৫ বছর বয়সের পরে মার্টিনের দেহ, চোখ আস্তে আস্তে নড়ার ক্ষমতা পায়, আর বিশেষ একটা কম্পিউটার দিয়ে মার্টিন আস্তে আস্তে সবার সাথে যোগাযোগ করতে, কথা বলতে পারেন, আবার, এক যুগ পরে। আস্তে আস্তে পড়াশোনা করেন, অবশেষে হন একজন ওয়েব প্রোগ্রামার/ডিজাইনার। আর নিজের গল্পটা লিখে ফেলেন একটা বই আকারে।

মার্টিনের এই গল্পটা কেন বলছি? একারণেই বলছি, আশার আলো, আঁধারের মাঝেও পথ দেখা কখনোই বন্ধ করবেন না। আপনার যে অবস্থা, তার চাইতেও ভয়াবহ অবস্থায়, নিজের দেহের কারাগারে বন্দী মার্টিন হাল ছাড়েননি, পথ খোঁজা বন্ধ করেননি, মনের জানালা রেখেছেন খোলা।

কাজেই আপনিও পারবেন। আঁধার দেখা বাদ দেন, আলোর খোঁজ করুন। বেশি রোদের দরকার নাই, খুঁজে নিন এক চিলতে আলো।

আপনার মনের আলো। সামনে যাবার, স্বপ্ন দেখার আলো।

মন প্রকৌশল বাড়ির কাজ

মন প্রকৌশলের জন্য বাড়ির কাজের তালিকা

মন প্রকৌশলের অংশ হিসাবে আপনাদের জন্য রইলো কিছু বাড়ির কাজ। নাহ, আমাকে পড়া দিতে হবে না, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনি নিজেই নিজেকে দিবেন।

১) মন প্রকৌশল, মন ভালো করার, স্বপ্ন দেখার প্রোজেক্ট কবে থেকে শুরু করছেন?

(এই প্রশ্নের একমাত্র সঠিক জবাব হল– আজই, এক্ষুনি। অন্য কিছু মাথায় আসলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিন, একটা কাগজে বড় বড় করে লিখুন, আমি আজই অমুক তারিখ এতটার সময় মন প্রকৌশলের কাজটা শুরু করে দিলাম। দরকার হলে দুইবার তিনবার এটা লিখুন, যাতে মনে প্রাণে এটা বিশ্বাস করতে পারেন।)

২) নিজের উপরে, নিজের শক্তির উপরে পূর্ণ বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন কি?

(আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বার বার জোর গলায় বলুন, আমি পারি, অবশ্যই পারি, নিজের শক্তিতেই পারি। যে যাই বলুক না কেন, আমি অবশ্যই পারি। এবং এই কথাটা কাগজে বড় করে লিখে নিজের বিছানার সামনের দেয়ালে বা পড়ার/কাজের টেবিলে লাগিয়ে দিন)।

৩) পিঠে কুলা, কানে তুলা– দিয়েছেন কি?

(নিন্দুক, পারবে না বলা, পিছিয়ে দেয়া লোকজনকে এড়িয়ে চলছেন তো? এড়াতে না পারলেও অন্তত কানে তুলা দিন, পিঠে বেঁধে নিন কুলা, এবং এসব কথা না শুনে নিজের লক্ষ্যে অটল থাকুন)।

৪) স্বপ্নের তালিকাটা তৈরি করেছেন তো?

(আপনার স্বপ্ন কী, আপনি কী চান, তা আপনাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। এবং এটা করতে হবে খুব সিস্টেম্যাটিকভাবে। তাই নিচের তালিকার মতো একটা ছক কাগজে লিখে ফেলুন, আর সেটাতে শুরু করে দেন স্বপ্নবাজি। সব স্বপ্ন আর তার জন্য করণীয় কাজ এবং সেই কাজগুলো কতটুকু কঠিন তা লেখার পরে র‍্যাংকিং করুন, আপনার কাছে কোন স্বপ্নটা সবচেয়ে বেশি আরাধ্য। খেয়াল রাখবেন, আপনার নিজের কথাই এখানে সবার আগে আসবে, অন্য কারো না। তাই এই তালিকা বানাবেন আপনি এবং কেবলই আপনি। আর কেউ না)

আপনার স্বপ্ন তা পেতে হলে আপনাকে কী করতে হবে?

স্বপ্নটা পেতে কতটা কষ্ট করতে হবে?

আপনার কাছে এই স্বপ্নের গুরুত্ব কতটুকু?

৫) কিছু শব্দ, বাক্য, চিন্তাকে পাঠিয়েছেন কি চিরতরে নির্বাসনে?

(‘ভয়’, ‘না’, ‘পারি না’, ‘হবে না’, ‘টেনশন’– এসব শব্দকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেন মন থেকে। একেবারে চিরতরে নির্বাসনে। স্বপ্নবাজদের এসব কথা ভাবতে হয় না। কখনোই না)

এবং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ–

৬) শুরু করে দিয়েছেন কি?

(১ নম্বর বাড়ির কাজে বলেছিলাম শুরু করে দিতে। সেটা করেছেন তো? এক্ষুনি। আর এক মুহূর্তও পরে না। এক্ষুনি শুরু করে দেন।)

স্বপ্নবাজে ভরে যাক পৃথিবী। আগামীর বিশ্বটা গড়ে উঠুক স্বপ্ন দেখা, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়া, জীবন পাল্টে দেয়া মানুষদের হাতে।

স্বপ্ন দেখার, জীবন গড়ার অভিযানটা শুরু হোক সবার জন্যই।

স্বপ্ন দেখুন, দেয়াল থেকে সরিয়ে নেন পিঠ, আর গড়ে তুলুন নিজের জীবনকে।